শ্রীল-ভাগবতাচার্য্যের

লীলা-প্রসঙ্গ

(বরাহনগর শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমের বিবরণ)

পঞ্চম সংস্করণ

শ্রীহরিদাস ঘোষাল কর্তৃক

সংকলিত

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।

শ্রীল ভাগবতাচার্য্যের

লীলা-প্রসঙ্গ

(বরাহনগর শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমের বিবরণ)
পঞ্চম সংস্করণ

শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীহরিদাস ঘোষাল কর্তৃক
সংকলিত

প্রকাশক—
শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ ট্রাষ্টের "ট্রাষ্টী বোর্ড"
শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম,
কলকাতা - ৭০০ ০৩৫

প্রথম প্রকাশ :
৭ই শ্রাবণ, শ্রীগুরু পূর্ণিমা তিথি,
বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, গৌরাঙ্গাব্দ ৪৫১।

পঞ্চম সংস্করণ :
ঝুলন পূর্ণিমা
বঙ্গাব্দ ১৪১৭ ঃ গৌরাঙ্গাব্দ ৫২৫

মুদ্রকার :
রায় প্রিন্টার্স
৯৪৩৩১৯৫৪৩৬/৯৬৭৪৯৯০৩৮৯

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম
কলিকাতা-৭০০ ০৩৫
দূরভাষ ঃ ২৫৭৭-০১৩৩

/\

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীল ভাগবতাচার্য্যের লীলা-প্রসঙ্গ নামক শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমের বিবরণ গ্রন্থটির রচয়িতা আমাদের জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা নিত্যধামগত শ্রদ্ধেয় শ্রীহরিদাস ঘোষাল মহাশয়। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ৭ই শ্রাবণ শ্রীগুরুপূর্ণিমার দিন। ইহার দ্বিতীয় প্রকাশকাল ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় প্রকাশকাল ১৩৯১ বঙ্গাব্দ এবং চতুর্থ প্রকাশকাল ১৪০৪ বঙ্গাব্দ। বর্ত্তমান গ্রন্থটি সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হওয়ায় ভক্তসমাজে ইহার প্রয়োজনীতা দৃষ্ট হয়। ভক্তগণের প্রয়োজনানুরোধে ইহার পুঃপ্রকাশনে একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও নানা সমম্যায় প্রকাশকার্য্যে বিলম্ব ঘটিল। পরিশেষে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীগুরুদেবের অপার করুণায় গ্রন্থটি পঞ্চমবার পুনঃ প্রকাশিত হইল।

বর্ত্তমান কাগজ ও ছাপাখরচ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রন্থের ভিক্ষাও যথোচিত বর্দ্ধিত হইল। যথাসম্ভব নির্ভুল ছাপিবার চেষ্টা সত্ত্বেও যদি কোন স্থানে ভুলক্রটি থেকে যায়, সহৃদয় ভক্ত পাঠকগণ তাহা নিজগুণে ক্ষমা করিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন। ভক্তগণ ইহার আস্বাদনে আনন্দিত হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব।

৭ই ভাদ্র, মঙ্গলবার

ঝুলন পূর্ণিমা

বঙ্গাব্দ ১৪১৭ সাল , চৈতন্যাব্দ ৫২৫

প্রকাশক

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।
ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।

গ্রন্থকারের নিবেদন

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

পরম করুণ শ্রীভাগবত আচার্য্য ঠাকুর, বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগুরুদেব ও কৃপাসিন্ধু শ্রীবৈষ্ণবগণের অপর কৃপায় আমার বহুদিনের সঞ্চিত সাধ "শ্রীল ভাগবতাচার্য্যের লীলাপ্রসঙ্গ" গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেন।

১৩৩৪ সালে ৪ঠা চৈত্র আমাদের পূজ্যপাদ বাবাজী মহাশয় এই শ্রীভাগবত আচার্য্য ঠাকুরের শ্রীপাটের শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের সেবা গ্রহণ করিবার পর হইতেই আমার মনে একটি তীব্র বাসনা হইয়াছিল যে—এই শ্রীভাগবত আচার্য্য ঠাকুর কাহার শিষ্য, ইঁহার বাড়ী কোথায়, ইনি কি করিতেন, কোন সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কবে লীলা সাঙ্গ করিয়াছিলেন ইত্যাদি বিবরণ বিশেষভাবে সংগ্রহ করিতে হইবে।

সেইদিন হইতে আমি শ্রীগ্রন্থ এবং লোকের মুখ হইতে শ্রীভাগবত আচার্য্য ঠাকুর সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলাম। যে শ্রীমদ্ভাগবতখানি পাঠ করিয়া শ্রীরঘুনাথ আচার্য্য শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে শুনাইয়াছিলেন, যাহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমাবেশে নয় ঘণ্টা অবিশ্রান্ত উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়াছিলেন এবং যে তালপত্রে লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতখানি অদ্যাপি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে থাকিয়া অতি যত্নে সেবিত হইতেছেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবতখানি হইতে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিলাম। পরে ১৩৩৯ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের শ্রীআনন্দনারায়ণ ভাগবতভূষণের পুত্র শ্রীগোপেন্দুভূষণ মৈত্র মহাশয়ের গৃহ হইতে খুব বড় ৫টি বাক্সে (যাহার ওজন ১১ মন) প্রায় ১৫০০ (দেড় সহস্র) বহু পুরাতন হস্তলিখিত পুঁথি শ্রীপাঠবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরে একদিন রাত্রে বাবাজী মহাশয় ইষ্টগোষ্ঠীর সময়

বলিলেন, "এই সমস্ত পুঁথির সেবা করিলে তিন প্রভুর কৃপা হয়। কারণ তাঁহারই এই সমস্ত পুঁথি শ্রীবৃন্দাবন থেকে কত কষ্ট কত পরিশ্রম ক'রে এই বাংলাদেশে নিয়ে এসেছিলেন।" পরে আমার দিকে চেয়ে বলিলেন, "ঘোষাল! তুমি এই গ্রন্থের সেবা কর, গ্রন্থগুলি বাক্সের ভিতর থেকে বার ক'রে তাঁদের নাম লিখে সাজিয়ে রাখ।" আমিও 'যে আজ্ঞা' বলিয়া পরদিন সকাল হইতেই গ্রন্থগুলি বাহির করিয়া তাঁহাদের নাম, গ্রন্থকর্তার নাম, লিপিকাল ও কত পৃষ্ঠা তাহা লিখিতে লাগিলাম। আমাদের টোলের অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয় ও তাঁহার ছাত্র শ্রীভবতারণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আরও দুই একজন মিলিয়া গ্রন্থগুলি সাজাইতে লাগিলাম। সুতরাং এই উপলক্ষ্যে সমস্ত পুঁথিগুলি আমি দেখিবার এবং পড়িবার সুবিধা পাইলাম। সেই সমস্ত পুঁথি হইতে শ্রীভাগবত আচার্য্য ঠাকুরের যে যে লীলা পাইলাম সংগ্রহ করিলাম।

পরে ১৩৪১ সালের ২২শে চৈত্র আমাদের পূজ্যপাদ বাবাজী মহাশয় প্রায় ২০,০০০ (বিশ সহস্র) টাকা ব্যয় করিয়া 'শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির' নামে একটি বৃহৎ গ্রন্থমন্দির বা লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সেই দিনই পানিহাটির শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয়ের সংগৃহীত প্রায় ২০০০ (দুই সহস্র) হস্তলিখিত বহু পুরাতন পুঁথি এই পাঠবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আমি বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। সুতরাং পানিহাটির গ্রন্থগুলি দেখিবার অবকাশ পাই নাই। পরে ১৩৪২ সালের শ্রাবণ মাসে আমার শরীর অসুস্থ হওয়ার বাবাজী মহাশয়ের অনুমতি লইয়া কিছুদিনের জন্য শ্রীধাম বৃন্দাবন গমন করি; কিন্তু সেখানে যাইয়া ভীষণ রক্ত আমাশয় হইয়া শরীর আরও দুর্ব্বল হইয়া গেল। প্রায় মাসাবধি শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়া শ্রীপাঠবাড়ী ফিরিয়া আসিলে বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "আর কেন, অনেক দিন তো ঘোরা হল এখন বয়সও হয়েছে, শরীরও দুর্ব্বল হয়েছে, এখন শ্রীগ্রন্থমন্দিদের সেবা কর"। আমিও তাঁহর কথা শিরোধার্য্য করিয়া এই শ্রীগ্রন্থমন্দিরের সেবা করিতে আরম্ভ করিলাম। কাজেই পানিহাটি হইতে আনীত যে দুই সহস্র পুঁতি, তাহাও দেখবার সুবিধা হইল। তখন সেই সমস্ত পুরাতন পুঁথিগুলি হইতে শ্রীল ভাগবত আচার্য্য ঠাকুরের লীলা সম্বন্ধে যাহা পাইলাম এবং লোক পরম্পরায় যাহা শুনিলাম, তাহাই একত্র করিয়া "শ্রীল ভাগবতাচার্য্যের লীলাপ্রসঙ্গ" নামে শ্রীগ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

ইহার কিছুদিন পরে বাবাজী মহাশয় ঐ সমস্ত পুঁথিগুলি হইতে অদ্যাবধি

অপ্রকাশিত পুঁথিগুলি প্রকাশ করিবার জন্য "শ্রীশ্রীনিতাই সুন্দর" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আদেশ দিলেন।

পরে ১৩৪৩ সালের ১লা বৈশাখ হইতে "শ্রীশ্রীনিতাইসুন্দর" পত্রিকা প্রকাশিত হইতে লাগিলেন এবং "শ্রীল ভাগবতাচার্য্যের লীলাপ্রসঙ্গ" সেই মাস হইতে "শ্রীশ্রীনিতাইসুন্দর" পত্রিকায় প্রতি মাসে প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। ঠিক এক বৎসর পর চৈত্র মাসে "শ্রীল ভাগবতাচার্য্যের লীলাপ্রসঙ্গ" শেষ হইলেন। সেই শ্রীল ভাগবতাচার্য্যের লীলাপ্রসঙ্গ এখন গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইলেন।

আমি যাহা সংগ্রহ করিয়াছি এবং লোকমুখে শুনিয়াছি, তাহাই লিখিয়াছি। যদি কেহ কোনও শ্রীগ্রন্থে কিম্বা লোকমুখে ইহা ব্যতীত অন্য কোন লীলা দেখিয়া কিম্বা শুনিয়া থাকেন, আমাকে জানাইলে আমি শ্রীগ্রন্থে যোগ করিয়া দিব। কিম্বা আমি যাহা লিখিয়াছি, যদি কেহ কোনও শ্রীগ্রন্থ হইতে আমাকে দেখাইয়া দেন যে "ইহা ভুল হইয়াছে" আমি তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিয়া লইব।

শ্রীভগবত আচার্য্য ঠাকুরের অপ্রকট তিথি কোথাও না পাওয়ায় লিখি নাই, তাহার জন্মতিথিও লিখি নাই। কারণ, কোন লোকমুখেও শুনি নাই।

যাঁহারা "শ্রীশ্রীনিতাইসুন্দর পত্রিকা" ১২ মাসের পান নাই, তাঁহারা শ্রীভাগবত আচার্য্যের সমস্ত লীলা জানিতে পারিবেন না এবং যাঁহারা শ্রীশ্রীনিতাইসুন্দরের গ্রাহক হইতে পারেন নাই, তাঁহারাও জানিতে পারিলেন না। সেইজন্য সমগ্র লীলা স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলেন।

ভক্ত পাঠকগণ ইহা পাঠ করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র আনন্দ লাভ করিলে আমি শ্রম সফল জ্ঞান করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইব।

শ্রীভাগবত আচার্য্যের শ্রীপাঠবাড়ী
শ্রীগুরু পূর্ণিমা—
৭ই শ্রাবণ শুক্রবার ১৩৪৪
গৌরাঙ্গাব্দ ৪৫১
রাধারমণাব্দ ৮২

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ দাসানুদাস
শ্রীবৈষ্ণবচরণরেণু প্রার্থী
দীন হরিদাস ঘোষাল

সূচীপত্র

শ্রীরঘুনাথকে "শ্রীভাগবত আচার্য্য" উপাধিতে ভূষিত করিয়া পুনরায় শ্রীনীলাচল যাত্রা। ১৯—২৫ পৃঃ

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীরঘুনাথের কুটির হইতে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে কুটিঘাটে শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি পাকা আম্রফল কুড়াইয়া একটি ব্রাহ্মণকে দান। পরে সেই আম্রবৃক্ষের বিবরণ। পরে ২ জন পর্ত্তুগীজ সাহেবের শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন ও তাঁহার সম্বন্ধে কথোপকথন। শ্রীভাগবত আচার্য্য লিখিত "শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী" (শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বপ্রথম সুললিত বাংলা পদ্যানুবাদ) শ্রীগ্রন্থের ও শ্রীভাগবত আচার্য্য ঠাকুরের অপ্রকট। ২৬—৩৫ পৃঃ

সপ্তম অধ্যায়

বরাহনগর নামের উৎপত্তি। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বিবরণ। বরাহনগরে জলদস্যু বোম্বেটেদের আড্ডা। শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের সেবা প্রকাশ। শ্রীভাগবত আচার্য্যের স্বহস্ত লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত যাহা পাঠ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শুনাইয়াছিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রদত্ত পাদুকা যাহা এই শ্রীপাঠবাড়ীতে অদ্যাপি সেবিত হইতেছেন, তাহার বিবরণ। ৩৬—৪০ পৃঃ

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীভাগবত আচার্য্যের শ্রীপাঠবাড়ীর পুনঃ প্রকাশ ও শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের সহিত শ্রীশ্রীজগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রা দেবীর আগমন। শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর প্রথম সেবা প্রকাশ। পরে শ্রীস্বরূপদাস বাবাজীর সেবা গ্রহণ। এই সময় পূর্ব্বোক্ত বোম্বেটেদের ভীষণ বিপদে পড়িয়া শ্রীস্বরূপদাস বাবাজীর কৃপায় সেই বিপদ হইতে উদ্ধার ও দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ। ঘৃতপুষ্করিণীর বিবরণ। গভীর নিশীথে কীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণ। শ্রীস্বরূপদাস বাবাজীর অপ্রকট ও শ্রীনিবাস দাস বাবাজীর সেবা প্রাপ্তি। মাঘীপূর্ণিমাতে মহোৎসব। চৈত্র কৃষ্ণা দ্বাদশীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন উৎসব আরম্ভ। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সেবা প্রাপ্তি। শ্রীশশিভূষণ

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

উৎসর্গপত্র

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীরাধারমণৈকজীবন

শ্রীল শ্রীযুক্ত নীলরতন দাস বাবাজী মহাশয়ের শ্রীকরকমলেষু

কাকা !

নবীন যৌবন কালে, ম্লেচ্ছ দাস্যে সঁপি শির,
অর্জ্জন করিনু বহু অর্থ।
দম্ভ মান যশ আদি, তখনে আছিল কত,
অনর্থ আরও যে শত শত।।
চাকুরীর অনুরোধে, বরাহনগর গ্রামে,
আসি' বাস করিনু যখনে।
শ্রীল বড় বাবাজীর, সুধা মাখা গুণ কথা,
শুনা'তে লাগিলে দিনে দিনে।।
তাঁর নাম গুণ ডোরে, আকর্ষিয়া মোর এই,
পাপে ভরা ঘৃণিত জীবন।
মোহ ঘোর হ'তে তুলি, পিয়াইতে প্রেম সুধা,
পাঠবাড়ীতে কৈলে আনয়ন।।
ইংরাজীর ঊনবিংশ, শত অষ্টাদশ সালে,
চৈত্র কৃষ্ণা দ্বাদশীর দিনে।
শ্রীগৌরের আগমন, উৎসব আনন্দ মাঝে,
বাঁধি দিলে শ্রীগুরু-চরণে।।
বহু যত্ন পরিশ্রম, অঙ্গীকারে ফল রূপে,
এই গ্রন্থ হইলা প্রকাশ।
সে ফল তোমার করে, অর্পণ করিতে মোর,
মনে উপজিল অভিলাষ।।

বিদুরের ঘরে প্রভু, করিলে অঙ্গীকার,
খুদকণা অতীব আদরে।
সেই ভরসায় আজ, এই গ্রন্থ সমর্পণ,
করিলাম তোমার শ্রীকরে।।
নিত্যধাম হ'তে দেব, আশীষ করহ দীনে,
প্রভু পদে রহু দৃঢ় রতি।
তোমাদের গুণে যেন, সদাই ঝুরয়ে আঁখি,
লভি যেন প্রেম সবা প্রতি।।

দীন—

হরিদাস ঘোষাল

শ্রীগুরুদেব (বাবাজী মহাশয়)

নিতাই গৌর নামে এমন,
পাগল কোথা' দেখেছে কে?
নামে সদাই আপন হারা,
নয়ন জলে দেহভাসে।।
ভক্তি-পথের যাজনা হেরি,
পাষাণ রেখা কোথা' লাগে।
দর্শনে যাঁর পাপ তাপাদি,
সুদূর হ'তে সদা ভাগে।।
স্নেহভরা নয়ন দু'টি,
দৈন্য গড়া মূর্ত্তিখানি।
প্রেম-ভাণ্ডার উজাড় ক'রে,
দেয় সবারে আপন জানি।।
কীর্ত্তন রঙ্গে বিভোল হ'য়ে,
ফুকারে গৌর কোথায় ব'লে।
গোরার প্রেমে পাষাণ গলায়,
ডুবায় সবে প্রেম জলে।।
অদোষদর্শী পতিত-পাবন,
প্রভু আমার রামদাস।
বন্দি তাঁহার অভয়-পদ,
দশনেতে ধরি ঘাস।।

শ্রীপাঠবাড়ী
শ্রীগুরুপূর্ণিমা,
৭ই শ্রাবণ, ১৩৪৪

শ্রীবৈষ্ণবদাসানুসাভাস
শ্রীহরিদাস ঘোষাল

শ্রীল ভাগবতাচার্য্যের লীলাপ্রসঙ্গ

প্রথম অধ্যায়

শ্রীল রঘুনাথের গার্হস্থ্য জীবন ও গৃহত্যাগ

২৪ পরগণা জেলার আলমবাজার পোষ্ট অফিসের অধীনে "শ্রীল ভাগবত আচার্য্যের পাঠবাড়ী" নামে একটি শ্রীপাট আছেন, যেখানে রামকেলি হইতে শ্রীনীলাচল প্রত্যাবর্ত্তনের সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীল রঘুনাথ উপাধ্যায়ের শ্রীমুখ হইতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া তিনপ্রহর নৃত্য করিয়াছিলেন এবং শ্রীল রঘুনাথ উপাধ্যায়কে 'শ্রীভাগবতাচার্য্য' উপাধিতে বিভূষিত করিয়া আবার শ্রীনীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই শ্রীল রঘুনাথ উপাধ্যায়ের লীলাপ্রসঙ্গ শ্রীগ্রন্থাদিতে এবং লোকপরম্পরায় যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই এই প্রবন্ধে বর্ণিত হইবেন।

বর্দ্ধমান জেলার চান্দুলী পোষ্ট অফিসের অধীন একখানি গ্রাম, নাম ঘোড়ানাসী। প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামে এক নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার নাম শ্রীল রঘুনাথ উপাধ্যায়। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতে একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল।

তখনকার দিনে সমস্ত ব্রাহ্মণেরাই প্রায় শাক্তধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন বটে, কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম- মতাবলম্বী শ্রীকৃষ্ণ উপাসক ব্রাহ্মণ প্রায় কেহ ছিল না বলিলেই হয়। শ্রীল রঘুনাথ উপাধ্যায় যদিও শাক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি শ্রীগ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা করিবার জন্য বাসনা জন্মিয়াছিল এবং শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র পরতত্ত্ব ও জীবের একমাত্র সাধ্যবস্তু, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া এইটি তিনি বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গ্রামের ভিতর এমন কেহ ছিলেন না, যাঁহার সহিত তিনি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া আনন্দিত হন। কাজেই গ্রামত্যাগ করিবার জন্য মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন। পরে যখন তিনি প্রবীণ হইয়া সংসারে পূর্বরূপে অনসত্ত্ব হইলেন, তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া গ্রামত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জনে গঙ্গাতীরে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করিবার উদ্দেশ্যে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে বরাহনগরে

মালীপাড়ায় সুরধুনীর তীরে এই স্থানটি পরম নির্জন ও ভজনের অনুকূল দেখিয়া একটি পুষ্করিণীর ধারে দুইটি সন্নিহিত নিম্ববৃক্ষতলে সামান্য বাসোপযোগী একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ভজন করিতে আরম্ভ করিলেন। গৃহত্যাগ করিয়া আসিবার সময় "শ্রীদামোদর গোপাল" নামে শালগ্রামটি তিনি বক্ষে করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার কুলগুরুর নিকট হইতে যে শক্তিমন্ত্র পাইয়াছিলেন, তাহারই ভজন করিতে লাগিলেন এবং তুলসী ও গঙ্গাজল দ্বারা শ্রীদামোদর গোপালের সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে মনে একেবারেই শান্তি পাইতে ছিলেন না, তাই অধিকাংশ সময়ই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। যতই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে লাগিলেন, ততই শ্রীকৃষ্ণ ভজনের জন্য আগ্রহ বাড়িতে লাগিল। তখন সর্বদাই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "হায় ! আর কতদিনে শ্রীভগবান আমার প্রতি কৃপা করিবেন, আর কতদিনই বা এরূপভাবে দিন যাপন করিব, কবে শ্রীকৃষ্ণদাসের সঙ্গ পাইব।" এই চিন্তায় বিষমভাবে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের কৃপা যাহার উপর হইয়াছে তাহার আর জগতে অলভ্য কিছুই থাকে না, যখনই যাহা প্রয়োজন হয় তৎক্ষণাৎ তাহা আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন বৈকালে জাহ্নবীতীরে একটি নির্জ্জন স্থানে বসিয়া অস্তগমনোম্মুখ সূর্য্যদেবকে দেখিতে দেখিতে শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন। এমন সময় একটি গৃহস্থ তাঁহার সন্নিকটে আসিয়া উপবেশন করিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয় ! শুনিয়াছেন কি ? শ্রীনবদ্বীপে সুরধুনীতীরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র নামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে নাকি করুণাময় শ্রীভগবানের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তিনি নাকি হরিনামে দেশ মাতাইয়া তুলিতেছেন ও আচন্ডালকে প্রেমালিঙ্গন দান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। এমন কি শুনিলাম হরিদাস নামে এক যবনকেও নাকি তিনি কৃপা করিয়াছেন, তাঁহার নাম নাকি শ্রীগৌরাঙ্গ বা গৌরহরি!"

এই কথা কয়টি শুনিবামাত্র রঘুনাথের সেই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীনন্দ মহারাজের প্রতি গর্গমুনির বাক্যরূপে শ্লোকটি মনে উদয় হইল,—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হাস্য গৃহ্ণতোহনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।।

মহর্ষি গর্গ বলিলেন, "হে নন্দ মহারাজ! তোমার এই পুত্র প্রতিযুগে শরীর ধারণ করিয়া থাকে। কখনও শুক্লবর্ণ, কখনও বা রক্তবর্ণ, সম্প্রতি কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। ভবিষ্য কলিযুগে আবার পীতবর্ণ (গৌরবর্ণ) ধারণ করিবে।"

এই শ্লোকটি মনে উদয় হইবামাত্র রঘুনাথ অতি আগ্রহ সহকারে সেই অপরিচিত ভদ্রলোকটির মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়! সেই করুণাময় ভগবান শ্রীনবদ্বীপ জাহ্নবীতীরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র গৃহে উদয় হইয়াছেন, তবে ইনি কি সেই তিনি? যাঁহাকে বিশ্বসার তন্ত্রের একাদশ পটলে বলিয়াছেন,—

গঙ্গায়া দক্ষিণে ভাগে নবদ্বীপে মনোরমে।
কলিপাপবিনাশায় শচীগর্ভে সনাতনি।
জনিষ্যতি প্রিয়ে মিশ্রপুরন্দরগৃহে স্বয়ম্।
ফাল্গুনে পৌর্ণমাস্যাঞ্চ নিশায়াং গৌরবিগ্রহঃ।।

শ্রীমহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, "হে প্রিয়ে! কলিকলুষ বিনাশের নিমিত্ত গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্তী অতি মনোরম নবদ্বীপ গ্রামে ফাল্গুনী পূর্ণিমা নিশিতে মিশ্রপুরন্দর গৃহে শচীদেবীর গর্ভে স্বয়ং ভগবান গৌররূপে অবতীর্ণ হইবেন।"

এই শ্লোকটি রঘুনাথের মানসপটে আসিয়া উদিত হইবামাত্র রঘুনাথ অতিশয় ব্যগ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনি এ অমূল্য সংবাদ কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন?" তখন ভদ্রলোকটি যেরূপ অযাচিতভাবে এই সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই আনুপূর্ব্বিক বলিতে লাগিলেন।

"মহাশয়! কল্য সন্ধ্যাবেলা যখন আমি অদূরে ঐ গঙ্গার ঘাটে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম, এমন সময় দেখিলাম একটি ভদ্রলোক "মাগো সুরধুনী, মাগো গঙ্গে, কৃপা কর মা", এই কথা বলিতে বলিতে অতি দ্রুতপদে গঙ্গার জলে নামিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল তিনি বিদেশী এবং বিশেষ ক্লান্ত এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত দেখিয়া বুঝিলাম, তিনি অনেক দূর হইতে হাঁটিয়া আসিতেছেন। পরে তিনি স্নান করিয়া উপরে উঠিলে আমি ধীরে ধীরে তাঁহার সন্নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়ের নিবাস কোথায় এবং কোথায় যাইবেন?" জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি বলিলেন, "আমার নিবাস যশোহর জেলায়

তালখড়ি গ্রামে, আমি শ্রীলোকনাথ নামে আমার এক জ্ঞাতি ভ্রাতার অনুসন্ধানে শ্রীনবদ্বীপ যাইতেছি, পথিমধ্যে গঙ্গাস্নানের বাসনা হওয়ায় আমি এখানে আসিয়াছি, অদ্য রাত্রিটি এই স্থানে কোথাও অতিবাহিত করিয়া কল্য প্রাতে আমি আবার শ্রীনবদ্বীপে যাত্রা করিব।" এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "মহাশয়! যদি কৃপা করিয়া এই অধমের গৃহে এই রাত্রের মত অবস্থান করেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব।" তিনি বলিলেন, "আমার পরম সৌভাগ্য, চলুন আপনার গৃহেই আজ অতিতি হইব।" পরে তাঁহাকে গৃহে লইয়া গিয়া আহারাদির পর জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! আপনার ভ্রাতা শ্রীনবদ্বীপে কি জন্য গিয়াছেন এবং আপনিই বা কি জন্য তাঁহার অনুসন্ধানে যাইতেছেন, যদি কোনও আপত্তি না থাকে সবিশেষ আমাকে বলুন।" তখন সেই ভদ্রলোকটি বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়! লোকনাথের পিতা শ্রীপদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী আমার জ্ঞাতি খুড়া হন। লোকনাথ যৌবনের প্রারম্ভে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে গমন করেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য লাউড়াধিপতি রাজা দিব্য সিংহের মন্ত্রীপুত্র এবং বৈষ্ণব জগতের স্তম্ভ স্বরূপ। তাঁহার চতুষ্পাঠীতে সেই সময় শ্রীনিমাই নামে একটি বালকও বেদ ও শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিতেন। নিমাই ও লোকনাথ একত্রে শ্রীঅদ্বৈত গৃহে পাঠ্যাবস্থায় থাকাকালে পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ় প্রীতি জন্মে। সেই সময় শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য লোকনাথের শিক্ষার ভার শ্রীনিমাই-এর উপর অর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন—

অদ্বৈত কহে ওহে নিমাই কর অবধান।
লোকনাথে শিক্ষাইবা তত্ত্বানুসন্ধান।।
এত কহি প্রিয় শিষ্যে গৌরে সমর্পিলা।
শ্রীগৌরাঙ্গ লোকনাথে আত্মসাৎ কৈলা।।

যাহা হউক, শিক্ষা সমাপনান্তে নিমাই নবদ্বীপে আসিয়া পণ্ডিত সমাজে বরণীয় হইয়া উঠিলেন ,এবং লোকনাথ নিজ গৃহে যাইয়া শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তিধর্মে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

এই সময় লোকনাথের পিতা পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য সুলক্ষণা পাত্রীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। লোকনাথ এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র তাঁহার মা

শ্রীসীতাদেবীকে যাইয়া বলিলেন, "মা! আপনারা বৃথা আমার জন্য পাত্রীর অনুসন্ধান করিবেন না, আমি কিছুতেই বিবাহ করিব না।" কিন্তু লোকনাথ যখন দেখিলেন তাঁহার পিতামাতা কিছুতেই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না, তখন আর অন্য উপায় না দেখিয়া একদিন গভীর নিশীথে সকলের অলক্ষিতে এ জীবনের মত পিতামাতা ও তালখড়ি গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং শ্রীনিমাই-এর নিকট হইতে রসরাজ উপাসনা-তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া তাঁহারই আদেশে শ্রীধাম বৃন্দাবন গমন করিয়াছেন।

এদিকে লোকনাথের পিতামাতা লোক পরম্পরায় লোকনাথের শ্রীবৃন্দাবন গমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়া পড়িলেন এবং সমস্ত সংবাদ জানিবার জন্য আমাকে শ্রীনবদ্বীপ পাঠাইলেন। তাই আমি শ্রীধাম নবদ্বীপে গমন করিতেছি।"

এই বলিয়া সেই ভদ্রলোক সমস্ত রাত্রি আমার গৃহে শ্রীকৃষ্ণ কথায় অতিবাহিত করিয়া অদ্য প্রাতঃকালে আবার শ্রীনবদ্বীপে যাত্রা করিলেন।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীল রঘুনাথ উপাধ্যায়ের শ্রীনবদ্বীপ যাত্রা

পূর্ব্বোক্ত বরাহনগর নিবাসী ব্রাহ্মণটি মুখে শ্রীনবদ্বীপে করুণাময় শ্রীগৌর ভগবানের আবির্ভাব সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়া রঘুনাথ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "তবে ইনি কি সত্যই সেই তিনি? যদি তাই হয়, তবে যাই একবার তাঁর শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আসি।" পরে সেই ব্রাহ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়, আমি যেন সেই ভগবানের শ্রীচরণ দর্শন করিতে পারি।" এই বলিয়া আর কালবিলম্ব না করিয়া, একবার মাত্র নিজ কুটীরে যাইয়া একটি জলপাত্র আর সেই গোপালকে বক্ষে ধারণ করিয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীনবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রঘুনাথের মন তখন গৌররূপে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেই ব্রাহ্মণের মুখে "গৌর" এই কথাটি শ্রবণ করিবামাত্র শ্রীবৃন্দাবননিকুঞ্জের কোন এক নিভৃত লীলা রঘুনাথের মানসপটে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তখন সেই ব্রজসুন্দরীগণ যেরূপ গভীর নিশীথে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্যা হইয়া তাঁহাদের প্রাণনাথের উদ্দেশ্যে বনপথে ছুটিতেন, আমাদের "শ্বেতমঞ্জরী সখী" (শ্রীকৃষ্ণলীলায় নাম) রঘুনাথও শ্রীগৌরাঙ্গ দরশন আশায় দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া অনাহারে অনিদ্রায় অবিশ্রান্তভাবে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সুরধুনীর তীরে তীরে শ্রীনবদ্বীপ অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। মনের প্রবল অনুরাগে অতি কষ্টকর পথও তাঁহার নিকট সুখকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পথশ্রান্তি কাহাকে বলে তিনি কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না। পরমানন্দে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিন বেলা তৃতীয় প্রহরে শ্রীনবদ্বীপের সন্নিকটে একটি গঙ্গার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে শ্রীনবদ্বীপ দর্শন করিয়া রঘুনাথ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই এখানে পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

নবদ্বীপ হেন গ্রাম পৃথিবীতে নাই।
যাঁহা অবতীর্ণ হইলা চৈতন্য গোঁসাই।।

অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন এথা।।

গঙ্গার ঘাটে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর রঘুনাথ ধীরে ধীরে শ্রীনবদ্বীপধামের ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন এবং যাহা দেখিলেন, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

নবদ্বীপের পথ বালু সুশ্বেত কমল।
দুই পার্শ্বে অট্টালিকা শ্বেত নিরমল।
সুবর্ণ কমলধ্বজ পরশে গগনে।
শ্বেত পীত পতাকাদি উড়য়ে পবনে।।
দেউল প্রাসাদ কত দেবতা মন্দির।
সুপাঁতি শোভয়ে দিবা বিচিত্র প্রাচীর।।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি জাতি।
সারি সারি শোভে গৃহ সুন্দর বসতি।।
যোগী, ন্যাসী, ব্রহ্মচারী অসংখ্য বৈসয়।
কোন স্থানে গীতা পুরাণাদি পাঠ হয়।।
কোন স্থানে নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল।
শিশুগণে কোন স্থানে বাধায়ে কোন্দল।।
কদম্ব বকুল বৃক্ষ আছে স্থানে স্থানে।
তার তলে পিণ্ডা বাঁধা পরম শোভনে।।
নগর বেড়িয়া বহে সুরধুনী ধার
তার তটে গৌরাঙ্গের মোহন বিহার।।

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম দর্শনের সৌভাগ্য সম্বন্ধে শ্রীগ্রন্থাদিতে যাহা পাওয়া গিয়াছে—তাহাও পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

সর্ব্বতীর্থ ভ্রমিয়া তৈর্থিক যাহা পায়।
নবদ্বীপ স্মরণে সে লাভ শাস্ত্রে গায়।।
নবদ্বীপ দরশন করে যেই জন।
জন্মে জন্মে লভে সেই কৃষ্ণ-প্রেমধন।।

কর্ম্মবুদ্ধিযোগেও যে নবদ্বীপ যায়।
নরজন্ম আর সেই জন নাহি পায়।।
নবদ্বীপের শুদ্ধ ভক্তের চরণে পড়িয়া।
ভুক্তি মুক্তি সদা রহে দাসীরূপা হইয়া।।
হেন নবদ্বীপ-ধাম সর্ব্বধাম-সার।
কলিতে আশ্রয় করি জীব হয় পার।।

রঘুনাথ শ্রীনবদ্বীপের ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য দর্শনে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। বহুদিনের হারান জিনিষ প্রাপ্তি হইলে জীব যেমন আনন্দে আত্মহারা হয়, রঘুনাথেরও ঠিক সেই দশা হইয়াছে—তিনি যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, সেই দিকেই দেখিতেছেন যে, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ হইতে স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত সকলেই যেন আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া রহিয়াছে, এ যেন ত্রিতাপদগ্ধ কলির জীবের বাসস্থান নয়। এখানে সকলেই আনন্দময়। কোথাও দেখিতেছেন শত শত ভক্ত একত্রিত হইয়া খোল করতাল যোগে সুমধুর নৃত্য কীর্ত্তন করিতেছেন, কোথাও বা মণ্ডলী বন্ধনে বসিয়া শত শত ভক্ত শ্রীগীতা শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি শ্রীগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন, কোথাও বা অনেকগুলি বালক একত্রিত হইয়া নানাবিধ শাস্ত্র বিচার করিতেছে ও কলহ করিতেছে, প্রশস্ত রাজপথ দিয়া সারি সারি নদীয়া রমণীগণ কলসী কক্ষে সুরধুনীর দিকে গমন করিতেছেন। এই সমস্ত দর্শন করিতে করিতে রঘুনাথ পড়ুয়া মাতার (পোড়া মা) মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পার্শ্বস্থ দণ্ডায়মান একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া অতি সম্ভ্রমের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়। এখানে যে শ্রীভগবানের আবির্ভাব হইয়াছে, তিনি কোথায়?" ব্রাহ্মণ রঘুনাথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "ও, আপনি বুঝি বিদেশী, আচ্ছা, আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাকে শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ী দেখাইয়া দিতেছি।" রঘুনাথ সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! সেই ভগবান কি কৃপা করিয়া আমাকে দর্শন দিবেন? আমি বড়ই অধম পতিত জীব।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ভাই! এই ভগবান আমাদের মত পতিত জীবরে জন্যই আসিয়াছেন, অভিমানী ধনী মানী কুলীন পণ্ডিতেরা তাঁহার নিকট স্থান পান না। তিনি দীনবন্ধু, অধম পতিত

জীবের উপরই তাঁহার বিশেষ কৃপা, তারপর তাঁহার কোন জাতি বিচার নাই, যবন পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে স্থান পাইয়াছেন, এই কয়দিন হইল জগাই মাধাই নামে নবদ্বীপের দুই ভীষণ দুর্বৃত্তকে কৃপা করিয়া পতিতপাবন নামের সার্থকতা দেখাইয়াছেন। ভাই আর এক কথা শুন নাই, তাঁহার সঙ্গে অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ নামে এক করুণার মূর্ত্তি আছেন, তাঁর করুণার কথা ব্যক্ত করিবার ভাষা নাই, তিনি সর্ব্বদাই পাগলের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ান, আর সম্মুখে যাহাকে দেখেন তাহাকেই বলেন—

"আয় আয় ছুটে আয়, আর তোদের ভয় নাই। একবার গৌর হরি বল।"

ভাই। শ্রীগদাধর নামে শ্রীগৌরাঙ্গের আর এক অন্তরঙ্গ সহচর আছেন, যিনি একদণ্ডও তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারেন না, ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য নামে আর একজন বৃদ্ধ অন্তরঙ্গ, যাঁর আকুল ক্রন্দনের ফল স্বরূপ আমরা গৌরভগবানকে দর্শন করিতেছি।

ইঁহারা সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের অতি মর্ম্মী ভক্ত, ইঁহারা সকলেই অবিলম্বে শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইবেন।"

এইরূপে শ্রীগৌরভক্তগণের কথা কহিতে কহিতে উভয়ে শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা দেখিতে লাগিলেন মহা তেজঃপূর্ণ গৌরবরণ গৌরভক্তগণ একে একে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে প্রবেশ করিতেছেন। ইহারাও তাঁহাদের সঙ্গে প্রবেশ করিলেন।

সম্মুখের বৃহৎ তোরণ দ্বার পার হইয়া দেখিলেন দুই ধারে পুষ্পের উদ্যান, মধ্যে বৃহৎ তুলসীমঞ্চ। পুষ্পোদ্যানের নানাবিধ পুষ্পের সৌগন্ধ্যে চারিদিক আমোদিত করিয়াছে। আগন্তুক সকলেই শ্রীবৃন্দাদেবীকে প্রণাম করিয়া দ্বিতীয় দ্বার পার হইয়া বৃহৎ অঙ্গনে যাইয়া উপস্থিত হইতেছেন।

রঘুনাথ ও সেই ব্রাহ্মণ শ্রীতুলসীদেবীকে প্রণাম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন

রঘুনাথ শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত মহাশয় আগন্তুক ভক্তবৃন্দকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া হস্তধারণ পূর্বক বসাইতেছেন, যেন চাঁদের হাট বসিয়াছে। রঘুনাথ তখন সেই গৌরভক্তগণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন, "অদূরে ঐ যে বৃদ্ধ মহাপুরুষকে দেখিতেছেন, উনিই শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য। তাঁহার বামপার্শ্বে অতি দীনবভাবে করজোড়ে একজন দাঁড়াইয়া আছেন, উঁহার নাম শ্রীহরিদাস। তাঁহার সম্মুখে ঐ দেখুন মুরারি, মুকুন্দ, শ্রীধর, বক্রেশ্বর ইত্যাদি।" এইরূপে ব্রাহ্মণ একে এক সমবেত গৌর-ভক্তগণের পরিচয় করাইলেন। এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটির নাম শ্রীবনমালী আচার্য্য। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথম বিবাহের ঘটক ছিলেন, এখন শ্রীগৌরভক্তগণের অন্যতম।

ইতিমধ্যে শ্রীবাস পণ্ডিত মহাশয় অদূরে একজন নবাগত বিদেশী ভক্তকে দণ্ডায়মান দেখিয়া অতি দ্রুত তাঁহার সম্মুখে আসিয়া করজোড়ে অতি বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! এ অধমের প্রতি কৃপা করিয়া কোথা হইতে আপনার আগমন হইল? আপনাকে বিশেষ ক্লান্ত দেখিতেছি, আপনার বোধ হয় অদ্য স্নান আহারাদি কিছুই হয় নাই।" রঘুনাথ ঘাড় নাড়িয়া "না" উত্তর দিলে, পার্শ্বে দণ্ডায়মান কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীবাস বলিলেন, "শ্রীরাম। তুমি শীঘ্র ব্রাহ্মণের হস্তপদ ধৌত করিবার জল লইয়া আইস; এইরূপে দুই ভ্রাতাকে রঘুনাথের সেবায় নিযুক্ত করিয়া শ্রীবাস অন্যান্য ভক্তদের সহিত সম্ভাষণ করিতে গমন করিলেন।

রঘুনাথ এইরূপ অযাচিত করুণা দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এ কি! এরূপ নিঃস্বার্থ ভালবাসা যে জগতে আছে এ ত' আমার জানা নাই। এ আমি কোথায় আসিলাম? একি স্বর্গ, না বৈকুণ্ঠ, না গোলোক। এরূপ প্রীতি ভালবাসা ত' এ জগতের নয়? একমাত্র বৃন্দাবিপিনেই এ ভালবাসার সন্ধান পাওয়া যায়। তাও আবার শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—এই নিঃস্বার্থ ভালবাসা বৃন্দাবিপিনের বাহিরে যাইবে না; কিন্তু একি! এখানে যে

ভালবাসার ছড়াছড়ি দেখিতেছি। সকলেই যেন ভালবাসার মূর্ত্তি। শ্রীবৃন্দাবননিকুঞ্জে গভীর নিশীথে নির্জ্জন বনের ভিতর যে ভালবাসার ছড়াছড়ি হইয়াছিল, এবার কি সেই ভালবাসা কলির অধম পতিত জীবগণের নিকটেও ছড়াছড়ি হবে নাকি? তিনশত কোটী ব্রজসুন্দরীদের সঙ্গে ভালবাসার বিকিকিনি করিয়াও বুঝি আশা মিটে নাই, তাই এবার কলির জীবের সঙ্গে সেই ভালবাসার আদানপ্রদানের খেলা খেলিতে ভগবান আসিয়াছেন নাকি? তবে এ সব কি, কিছুই ত' বুঝিতে পারিতেছি না।" রঘনাথ এইরূপে যখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময় শ্রীপতি আসিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আমি আপনার জন্য তৈল ও বস্ত্র আনিয়াছি, গঙ্গাস্নানে চলুন।" রঘুনাথ যেন যন্ত্রবৎ চালিত হইয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া নিজ ইষ্টদেবকে স্মরণ করিবেন, এমন সময় শ্রীবাস পণ্ডিত আসিয়া বলিলেন, "মহাশয়! সামান্য কিছু আহার করিবেন আসুন, কারণ, প্রভু আসিলে আর আহারের সময় পাইবেন না।" তখন রঘুনাথ শ্রীবাস পণ্ডিতের বিশেষ অনুরোধে অগত্যা ভোজনে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়! প্রভু কি আমার মত পতিত জীবকে কৃপা করিবেন? আমার নিবাস বর্দ্ধমান জেলায়। এখন বরাহনগরে গঙ্গাতীরে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছি। ভাগ্যক্রমে একটি ব্রাহ্মণের নিকট হইতে শ্রীনবদ্বীপে শ্রীভগবনের আবির্ভাব সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি। আপনি যদি কৃপা করেন তবেই আমার বাসনা পূর্ণ হইতে পারে। আপনাদের কৃপা ভিন্ন আমার বাসনা পূর্ণ হইবে না।" দুইজনে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় সংবাদ আসিল—"প্রভু আসিতেছেন।" রঘুনাথ অতি দ্রুত আহার সমাপনান্তে বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। দেখিলেন সমস্ত ভক্তগণ দণ্ডায়মান হইয়া একদৃষ্টে পথের দিকে চাহিয়া আছেন।

এদিকে শ্রীনদীয়ার চাঁদ বামে শ্রীগদাধরের বাম স্কন্ধেও দক্ষিণে শ্রীনিতাইচাঁদের দক্ষিণ স্কন্ধে হস্ত দিয়া মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে শ্রীবাস-অঙ্গনের দিকে আসিতেছেন। নদীয়ার পথে যেন কোটী চন্দ্রের উদয় হইয়াছে। দুই পার্শ্বে অট্টালিকা হইতে নদীয়া-রমণীগণ একদৃষ্টে সেই ভুবনমোহন রূপ দেখিতেছেন। যিনি দেখিতেছেন তিনি আর চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছেন না।

একই প্রকার বেশে তিনজনে সজ্জিত হইয়া নদীয়ার পথ আলো করিয়া চলিয়াছেন। তিনজনেরই গলদেশে মালতীফুলের সুন্দর মালা, সুবলিত সর্ব্বঅঙ্গ

সুগন্ধিচন্দনে চর্চ্চিত, পরিধানে দিব্য বাস, আজানুলম্বিত ভুজযুগলে পুষ্পের বলয়, কুন্দবিনিন্দিত দন্তরাজিতে যেন চন্দ্রালোক উদ্ভাসিত হইতেছে, আকর্ণবিস্তৃত নয়নযুগলে যেন করুণার ধারা প্রবাহিত হইতেছে, প্রশস্ত ললাটে সুন্দর তিলক শোভা পাইতেছে, হস্তপদনখরে যেন কোটী চন্দ্রের বিকাশ হইতেছে, মৃদুমন্দ হাসিতে যেন অমৃত বৃষ্টি হইতেছে। সকলেই অনিমেষনয়নে সেই তিন প্রভুর দিকে চাহিয়া আছেন, এমন সময় ধীরে ধীরে তাঁহারা শ্রীবাস-অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্তগণ সকলে সমস্বরে "হরিবোল, হরিবোল" ধ্বনি করিয়া প্রণাম করিলেন, শ্রীগৌরসুন্দরও মৃদুমন্দ হাসিয়া সকলকে আদর সম্ভাষণ জানাইলেন।

শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে প্রত্যেক ভক্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অদূরে একজন নবাগত ভক্তকে দণ্ডায়মান দেখিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিত! ইনি কে?" শ্রীবাস বলিলেন, "ইনি বরাহনগর হইতে আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।"

এদিকে রঘুনাথ মনের অত্যধিক আনন্দে এবং প্রাণের আকুল আবেগে কথা কহিতে পারিতেছেন না। তিনি বিস্মিত হইয়া একবার প্রভুর বদনচন্দ্রের প্রতি চাহিতেছেন, আর একবার শ্রীনিতাইচাঁদের বদন-সুধা পান করিতেছেন। একই সঙ্গে দুই চন্দ্রের উদয় দেখিয়া রঘুনাথের বাক্যস্ফুর্ত্তি হইতেছে না। কিন্তু রঘুনাথ আর বেশীক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিতে পারিলেন না, ছিন্নমূল তরুর ন্যায় প্রভুর চরণতলে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

প্রভু তখন গদাধরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"গদাধর! ইহার ভার তোমার উপর রহিল, ইহার যাহা কিছু প্রয়োজন তুমিই দিবে।"

এদিকে করুণার মূর্ত্তি শ্রীনিতাইচাঁদ রঘুনাথকে মূর্চ্ছিত অবস্থায় প্রভুর চরণতলে পতিত দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। "যে গৌর বলে একবার, সে আমার আমি তার।" এই কথা ডচ্চারণ করিতে করিতে রঘুনাথকে উঠাইয়া নিজ বক্ষঃস্থলে ধরিলেন। কিছুক্ষণ পরে রঘুনাথের যখন চৈতন্য হইল, তিনি দেখিলেন যে, তিনি শ্রীনিতাইচাঁদের বক্ষের ভিতর রহিয়াছেন। তখন বক্ষঃস্থল হইতে শ্রীচরণতলে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হা প্রভু! আমি অধম

পতিত জীব, আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া পতিতপাবন নামের সার্থকতা করিলেন।" তখন শ্রীনিতাইচাঁদ বলিলেন, "তুমি যাহাই হও. তুমি যখন শ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শন করিতে আসিয়াছ, তখন তুমি আমার বুকের জিনিষ।"

ইতিমধ্যে রঘুনাথ গাত্রোত্থান করিয়া যোড়হস্তে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রভুর লীলাদর্শন করিতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রীবাস পণ্ডিত মহাশয় সুবাসিত জল আনিয়া প্রভুর শ্রীচরণ ধৌত করিয়া দিলেন এবং প্রভুকে সিংহাসনে বসাইলেন। প্রভু সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন, শ্রীনিতাইচাঁদ প্রভুর দক্ষিণ পার্শ্বে ও শ্রীগদাধর বামপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন এবং নরহরি চামর করিতেছেন। তখন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, মুকুন্দ, মুরারি, শ্রীধর, বক্রেশ্বর প্রভৃতি প্রভুর সন্ধ্যারতির উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পরে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়া প্রভুর আরতি করিতে লাগিলেন। মুকুন্দ, মাধব, বাসুঘোষ প্রভৃতি ভক্তগণ সুমধুর গান করিতে লাগিলেন। তখন মৃদঙ্গ, মন্দিরা, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর নিনাদে শ্রীবাস-অঙ্গন প্রকম্পিত হইতে লাগিল। নদীয়া-রমণীগণ গৃহাভ্যন্তর হইতে শুভ উলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ সকলে মিলিয়া সমস্বরে আরতি গীত গাহিতে আরম্ভ করিলেন।

।। গৌরী রাগ।।

জয় জয় আরতি গৌর কিশোর।
বিলসত সিংহাসন জনু কনকাচল
ডগমগ জগতি যুবতী চিতচোর।।
শ্রীঅদ্বৈত প্রেমভরে গর গর, আরতি
করু নিজনাথ নেহারি,
দক্ষিণ ভাগে ভাতি রীতি অদ্ভুত
নিত্যানন্দ চন্দ্র রসে ভোর।
বামে গদাধর সরস ভঙ্গী তহি
কোই ধরত নবছত্র উজোর।। ইত্যাদি

শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু আরতি সমাপনান্তে প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অন্যান্য ভক্তগণও এই সময় আসিয়া কীর্ত্তনে যোদ দিলেন। কিন্তু রঘুনাথ লজ্জায় ও ভয়ে যাইতে পারিলেন না; সজল নয়নে

পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারসকলে বিভূষিত হইয়া করযোড়ে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রভুর সঙ্কীর্ত্তন রাসলীলা দর্শন করিতে লাগিলেন। এদিকে মহাসঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন হইল। খোল-করতালের মধুর ধ্বনিতে শ্রীবাসঅঙ্গন প্রকম্পিত হইল। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিতাইচাঁদ ও শ্রীগদাধরের হস্তধারণ করিয়া যেমন সংকীর্ত্তনস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অমনি ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের তিনজনকে ঘিরিয়া মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। একেবারে মহারাসলীলা প্রকট হইল। শ্রীবৃন্দাবনের রাসলীলাস্থলী ও শ্রীনবদ্বীপের সঙ্কীর্ত্তন-লীলাস্থলী এক বস্তু এক তত্ত্ব। ভক্ত ভগবানের অবাধ ও নিঃসঙ্কোচ মিলনস্থানের নাম রাসলীলাস্থলী, আর তাঁহাদের মধুর মিলনলীলার নাম রাসলীলা। বৃন্দাবন-নিকুঞ্জ হইতে শ্যামের বাঁশরী শ্রবণে মুগ্ধা ব্রজবালাগণ, লজ্জা, ভয়, কুল, শীল, মানে জলাঞ্জলি দিয়া যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, মনপ্রাণ উন্মাদকারী খোলকরতালের সুমধুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভক্তবৃন্দেরও ঠিক সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। কারণ, বস্তু, এক, স্থান এক, লীলাও এক; ব্রজে যাহা হইয়াছিল, এখানেও তাহা হইতেছে।

নিত্যসিদ্ধা ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারে তাঁহাদের প্রাণবল্লভের সেবা করিবার জন্য ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীনবদ্বীপ ধামে আসিয়া উদিত হইয়াছেন। পূর্ব্বলীলার ভাব তাঁহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে। তাঁহারা যে লীলাই করিতেন, তাহা ব্রজলীলারই অনুরূপ। শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য সেখানেও যেমন মাদনাখ্যমহাভাবে বিভূষিতা শ্রীরাধারাণীই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের বাসনাপূর্ত্তির মূর্ত্তি, এখানেও সেই শ্রীনিতাইচাঁদই শ্রীগৌরাঙ্গের সমস্ত বাসনাপূর্ত্তির মূর্ত্তি। সেখানে যেমন শ্রীরাধিকার বিশেষ মনোবৃত্তিস্বরূপা ব্রজসুন্দরীগণ সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য লালায়িতা, এখানেও সেইরূপ শ্রীনিতাইচাঁদের বিশেষ কায়ব্যূহস্বরূপ ভক্তগণ সর্ব্বদাই শ্রীগৌরাঙ্গের সুখের জন্য ব্যস্ত। শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু শ্রীগৌরাঙ্গ যখন যে ভাবে বিভাবিত হইতেন, শ্রীনিতাইচাঁদও তখন সেইভাবে সুখ দিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত হইয়া "হা কৃষ্ণ! হা নিষ্ঠুর!" বলিয়া বিলাপ করিতেন, তখন শ্রীনিতাইচাঁদ ও শ্রীকৃষ্ণভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে সুখ দিতেন। আবার শ্রীগৌরাঙ্গ যখন শ্রীকৃষ্ণভাবে বিভাবিত হইয়া "হা রাধে, হা প্রাণেশ্বরি" বলিয়া রোদন করিতেন, তখনও শ্রীনিতাইচাঁদই শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে সুখ দিতেন। ইহাই শ্রীনিতাইচাঁদের নিগূঢ় রহস্য। শ্রীগৌরাঙ্গের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তগণই ইহা আস্বাদন করিয়া থাকেন।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট শ্রীল রঘুনাথের মন্ত্রাগ্রহণ ও বরাহনগরে প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীবাস-অঙ্গনে মহা-সংকীর্ত্তন রাসলীলা হইতেছে। ভক্তগণ মণ্ডলীবন্ধনে তিন প্রভুকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছেন এবং রঘুনাথ একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন। এমন সময় শ্রীশ্রীনিতাইচাঁদ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, দ্রুত যাইয়া কীর্ত্তনমণ্ডলী মধ্যে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। পদভরে ধরণী কম্পিত হইতে লাগিল। তখন সকলেই বাহ্যজ্ঞানরহিত, সকলেই ব্রজলীলারসে ডুবিয়া নৃত্যকীর্ত্তন করিতেছেন। কিছুক্ষণ উদ্দণ্ড নৃত্য করিবার পর শ্রীনিতাইচাঁদ তাঁহার ভুবনমোহন ক্ষীণ কটি দোলাইয়া মনোহর মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। কখনও বা নৃত্য করিতে করিতে দ্রুত যাইয়া প্রাণ গৌরাঙ্গকে নিজের বুকের ভিতর টানিয়া লইতেছেন, আবার কখনও বা দুই হস্তে প্রাণ-গৌরাঙ্গের গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বক্ষের উপর মালার ন্যায় ঝুলিতে লাগিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া আমাদের শ্বেতমঞ্জরী রঘুনাথ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; লজ্জা, ভয়, কুল, শীলে জলাঞ্জলি দিয়া একেবারে সঙ্কীর্ত্তন-রাসমণ্ডলীর মধ্যে ঝাঁপ দিলেন। তখন সকলেই যুগলে মিলিত শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রত্যেকেই দেখিতেছেন যে, প্রাণের প্রাণ গৌরসুন্দর আমার নিকটেই নৃত্য করিতেছেন। মহারাসমণ্ডলীর মধ্যে ব্রজসুন্দরীগণ যেমন প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া রাসবিলাসে আত্মহারা হইয়াছিলেন এবং কাহারও অন্য কোন দিকে লক্ষ্য ছিল না, এখানেও ঠিক তাহাই হইয়াছিল।

এদিকে শ্রীগদাধর একদৃষ্টে শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গের যুগলমিলন দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান আছেন এবং আপন মনে চিন্তা করিতেছেন, "আহা আমার বরণ ধরে পরাণ বঁধূ কেমন সেজেছে।"

এদিকে শ্রীনিতাইচাঁদ আবার উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তখন গৌরসুন্দর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, মধুর নয়নরঞ্জন অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে গদাধরের হস্ত দুইখানি ধরিয়া দুইজনে অদ্ভুত নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলেই

আনন্দ সাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন, কাহারও বাহ্যজ্ঞান নাই, সকলেই উন্মত্ত। এইরূপ নৃত্য করিতে করিতে কেহ যদি অতিরিক্ত প্রেমমদিরাপানে বিভোর হইয়া ঢলিয়া পড়ে, আমাদের বিলাসী গৌরাঙ্গচাঁদ অমনি তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করেন।

এইভাবে যখন সকলেই উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তনে উন্মত্ত, এমন সময় হঠাৎ গৌরসুন্দর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। তখন ভক্তগণ চারিপার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিছুক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া গৌরসুন্দর বলিয়া উঠিলেন—

নারিব নারিব হেথা রহিবারে আমি।
দেখিবারে যাব যথা বৃন্দাবনভূমি।।

এই কথা শুনিয়া সকলেই মর্ম্মাহত হইলেন, তখন নিতাইচাঁদ ধরিয়া গৌরসুন্দরকে বসাইলেন। গদাধর অমনি প্রভুর পশ্চাদিকে যাইয়া বসিলেন, গৌরসুন্দর তখন গদাধরের অঙ্গে এলাইয়া পড়িলেন। একটু পরে আবার শতবৃশ্চিকদংশনের জ্বালার ন্যায় ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সোনার অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত, রোদন করিয়া নয়ন যুগল পদ্মপুষ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণ হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে আবার উঠিয়া গদাধরের অঙ্গে হেলান দিয়া নীরবে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিলেন এবং চতুষ্পার্শ্বে ভক্তগণ রোদন করিতেছেন দেখিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,-"তোমরা আমার বান্ধব, আমাকে বিদায় দাও, আর আমি তোমাদের কাছে থাকিতে পারিতেছি না, আমি আমার প্রাণনাথের উদ্দেশ্যে শ্রীবৃন্দাবন যাইব। তোমাদের যদি আমার প্রতি স্নেহ ভালবাসা থাকে, তবে আমাকে সন্তুষ্ট মনে বিদায় দাও। যদিও তোমাদের ফেলিয়া যাইতে আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইবে, 'কিন্তু কি করিব, আমার আর অন্য উপায় নাই।

কবে সে মধুর রূপ হেরিব নয়নে।
হিয়াতে চাপিব সেই রাতুল চরণে।।
এ ছার সংসরে আমি কেমনে রহিব।
নন্দের দুলাল আমি কোথা গেলে পাব।।"

ভক্তগণ কেহই এ কথার উত্তর দিতে পারিতেছেন না, কেবলই রোদন

করিতেছেন। প্রাণগৌরাঙ্গ নবদ্বীপ ছাড়িবেন, একথা মনে হইলেই তাঁহাদের চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া যায়। তাঁহারা কি করিবেন, কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না।

গৌরসুন্দর আবার বলিতে লাগিলেন, "আমার প্রাণাধিক বন্ধুগণ আমার কি গৃহে থাকিতে সাধ নাই? তোমাদের সঙ্গ যাহা ব্রহ্মাদিরও দুর্ল্লভ, ইহা কি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতেছি? আমি স্ববশে নাই। কৃষ্ণ আমাকে ঘরের বাহির করিতেছেন।" ভক্তগণ তখন ভুবন অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন, শ্রীবাসপণ্ডিত কেবল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তোমাকে কে রাখিবে, তবে এই করিও, তোমার সঙ্গে যদি কেহ যাইতে চাহে, তাহাকে যেন বারণ করিও না।"

গৌরসুন্দর তখন নিজে শান্ত হইয়া সকলকে শান্ত করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "তোমরা যেন এখনই ভাবিত হইও না, আমার এখনও বিলম্ব আছে। তারপর আমি একেবারে তোমাদের ফেলিয়া যাইব না। তোমরা সর্ব্বদাই আমাকে দেখিতে পাইবে। তোমার যখনই সঙ্কীর্ত্তন করিবে, তখনই আমাকে তাহার মধ্যস্থলে দেখিতে পাইবে।" শ্রীবাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তোমরা এই স্থানে আমাকে সর্ব্বদাই দেখিবে।" আর এক কথা বলি, "যে কেহ শ্রীকৃষ্ণভজন করিবেন, তিনিই আমাকে দেখিতে পাইবেন"।

এই সময় নিতাইচাঁদ হঠাৎ হুঙ্কার দিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। মুকুন্দ অমনি সুমধুর মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে আবার সকলেই নৃত্যকীর্তনে যোগ দিলেন। কিছুক্ষণ পরে নিশা অবসান দেখিয়া সকলে নৃত্যকীর্ত্তন সমাপন করিলেন। কিছুক্ষণ শ্রীবাস-অঙ্গনে বসিয়া ভক্তবৃন্দসহ কৃষ্ণকথা আলাপনে কীর্ত্তনশ্রম দূর করিলেন। পরে সকলে একত্রিত হইয়া সুরধুনীতে স্নান করিতে চলিলেন।

পথিমধ্যে রঘুনাথের দিকে দৃষ্টি পড়িলে গদাধরকে ডাকিয়া বলিলেন, "গদাধর! তুমি ইঁহাকে তোমার বাড়ীতে লইয়া যাও।" আর রঘুনাথকে বলিলেন, "তুমি অদ্যই বৈকালে বরাহনগরে যেখানে ভজন করিতে, সেই স্থানে যাত্রা করিবে।" তখন রঘুনাথ করযোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "প্রভু! আমি আপনাকে ছাড়িয়া আর কোথাও যাইব না, কৃপা করিয়া আমায় এই নবদ্বীপে

থাকিবার অনুমতি দিন।" প্রভু তখন রঘুনাথের নিকটে আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া বলিলেন, "রঘুনাথ! দুঃখ করিও না, তুমি স্বস্থানে যাও, আমার সহিত আবার তোমার শীঘ্রই দেখা হইবে।

রঘুনাথ শ্রীনবদ্বীপে গিয়াছেন মহাপ্রভুর গৃহত্যাগের প্রায় এক মাস পূর্ব্বে। কারণ, পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর শ্রীবৃন্দাবন গমনের পরে রঘুনাথ শ্রীনবদ্বীপ গিয়াছেন। শ্রীগ্রন্থাদিতে আছে—শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে শ্রীলোকনাথ শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন।

রঘুনাথ যখন বুঝিতে পারিলেন যে, প্রভু কিছুতেই তাঁহাকে এখানে রাখিবেন না, তখন চুপি চুপি শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিলেন, "আমার শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণের বাসনা আছে, আপনি যদি কৃপা করিয়া প্রভুকে বলেন।" শ্রীবাস পণ্ডিত গৌরসুন্দরকে তাহা জানাইলে প্রভু বলিলেন, "আমি ত' বলিয়াছি রঘুনাথের যাহা কিছু প্রয়োজন গদাধরই দিবে।" এবং গদাধরকে বলিলেন, "তুমি রঘুনাথের বাসনা পূরণ করিও।" পরে সকলে গঙ্গাস্নান করিয়া নিজ নিজ গৃহে চলিলেন। রঘুনাথও গদাধরের সহিত তাঁহার গৃহে গমন করিলেন। সেই দিনই গদাধরের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈকালে প্রভুর আদেশে কাঁদিতে কাঁদিতে রঘুনাথ আবার বরাহনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীমনমহাপ্রভুর সন্ন্যাস ও বরাহনগরে শ্রীল ভাগবতাচার্য্যের সহিত মিলন

বরাহনগরে প্রত্যাগমন করিয়া রঘুনাথ প্রাণের আবেগে শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর শ্রীনবদ্বীপলীলা স্মরণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর নিজ মুখে বলিয়াছেন—"তোমার সহিত আবার আমার দেখা হইবে" এই আশায় বুক বাঁধিয়া তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন এবং সর্ব্বদাই সেই মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সময় পাইলেই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। শ্রীনবদ্বীপ হইতে আসিবার পূর্ব্বে শ্রীগদাধর পণ্ডিত রঘুনাথকে কিছুক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন এবং রঘুনাথের শ্রীমদ্ভাগবতে পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন এবং রঘুনাথের শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি জানিতে পারিয়া তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবতের একখানি সুললিত বঙ্গানুবাদ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। বরাহনগরে আসিবার পর রঘুনাথ সেই বিষয়েও চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন একবার মাত্র ভিক্ষায় বাহির হন এবং যাহা পান তাহাই একসঙ্গে পাক করিয়া শ্রীগোপালের ভোগ দিয়া প্রসাদ পান। এইরূপে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এদিকে ১৪৩১ শকাব্দের পৌষ সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু ২৪ বৎসর বয়সে বৃদ্ধা মাতা, যুবতী স্ত্রী ও প্রাণ হইতে প্রিয়তম অসংখ্য ভক্তগণকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া গোপনে গভীর নিশীথে শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া যাত্রা করিলেন; পরে সাঁতরাইয়া সুরধুনী পার হইয়া কাটোয়ায় (কণ্টক নগরে) যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে বৈষ্ণবসন্ন্যাসী শ্রীকেশব ভারতীয় নিকট হইতে ১লা মাঘ সন্ন্যাসমন্ত্র গ্রহণ করিয়া পরদিন প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে রাঢ়দেশে তিন দিন ভ্রমণ করিবার পর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ছলনায় শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া শ্রীশচীমাতা ও নবদ্বীপবাসী ভক্তগণকে সান্ত্বনা দিয়া দোলযাত্রার পূর্ব্বে শ্রীনীলাচল ধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পরে চৈত্র মাসে শ্রীনীলাচলে রাজা প্রতাপরুদ্রের বিশ্ববিখ্যাত নৈয়ায়িক সভাপণ্ডিত শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টচার্য্যের বিদ্যা ও জ্ঞানগর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন এবং ষড়্ভুজমূর্ত্তি দর্শন করাইয়া তাঁহাকে নিজ চরণতলে টানিয়া আনিলেন। সেই সময় শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক দণ্ডের ভিতর একশত শ্লোকদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বন্দরা করিয়াছিলেন।

শত শ্লোক কৈল দন্ড এক না যাইতে।
বৃহস্পতি ঐছে শ্রোক না পারে করিতে।।

চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ অধ্যায়

পরে ১৪৩২ শকাব্দের বৈশাখ মাসের মধ্যভাগে তীর্থদর্শন ও শ্রীবিশ্বরূপের অনুসন্ধান উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত দক্ষিণদেশ প্রেমবন্যায় প্লাবিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণদাস নামে একটিমাত্র সরল ব্রাহ্মণবালককে সঙ্গে লইয়া শ্রীধাম নীলাচল হইতে যাত্রা করিলেন।

মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস।
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস।।
চৈত্রে রহি সার্ব্বভৌম কৈল বিমোচন।
বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ যাইতে কৈল মন।।

চৈঃ চঃ মধ্য ৭ম অধ্যায়

পরে পথিমধ্যে গোদাবরী নদীতীরস্থ বিদ্যানগরের অধিপতি পরম ভাগবত শ্রীরামানন্দ রায় নামে এক রসিক ভক্তের সহিত মিলিত হইয়া এবং বাসুদেব নামে এক গলিতকুষ্ঠরোগীর ব্যাধি মোচন করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত দক্ষিণ দেশের নানারূপ মতাবলম্বী সাধুগণের নিকট ভক্তি ধর্ম্ম প্রচার করিয়া দুই বৎসর পরে রথযাত্রার কিছু দিন পূর্ব্বে আবার শ্রীনালাচলধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; রাজগুরু কাশীমিশ্র মহাশয়ের গম্ভীরা-গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। আবার শ্রীনীলচলবাসী ভক্তগণের মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিল। পরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও অন্যান্য ভক্তগণ যুক্তি করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাগমন সংবাদ শ্রীনবদ্বীপে পাঠাইলেন। পরে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সহিত শ্রীনবদ্বীপবাসী ভক্তগণ অতি শীঘ্র নীলাচলে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত

মিলিত হইলেন। এইরূপে শ্রীনালাচলবাসী ও শ্রীনবদ্বীপবাসী ভক্তগণকে লইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণ্ডিচা মার্জ্জন, রথের অগ্রে নৃত্য কীর্ত্তন ইত্যাদি বহুবিধ লীলা করিলেন; এই সময় একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু গণসহ রথের অগ্রে নৃত্য করিতে করিতে যখন বলগণ্ডীর নিকটবর্ত্তী একটি উপবনে বসিয়া নৃত্য-পরিশ্রম কিছু লাঘব করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় রাজা প্রতাপরুদ্র বৈষ্ণববেশ ধারণ পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের "তব কথামৃতং তপ্তজীবনং" এই শ্লোকটি পাঠ করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদ সম্বাহন করিতে লাগিলেন। প্রভুও সেই শ্লোকটি শ্রবণ করিয়া প্রেমাবেশে রাজাকে আলিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিলেন। এই দিন হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর "রাজা প্রতাপরুদ্রের ত্রাণকারী" নামে অপর একটি নাম হইল।

এইরূপে দুই বৎসর অতীত হইবার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু আবার নীলাচল ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার বাসনা করিলেন এবং পথিমধ্যে জননী, জন্মভূমি ও মা জাহ্নবী দেবীত্রয়কে দর্শন করিয়া যাইবার মানসে আশ্বিন মাসের বিজয়াদশমীর দিন গৌড়দেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরে কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণাদ্বাদশীর দিন পানিহাটিতে পৌঁছিয়া সেখানে সুরধুনীতীরে বটবৃক্ষতলে বহুবিধ নৃত্য-কীর্ত্তন করিলেন। পরে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম ভাগে শ্রীধাম নবদ্বীপের পরপারে কুলিয়া গ্রামে সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে শ্রীনবদ্বীপবাসী ও চতুর্দ্দিকের ভক্তগণকে আকর্ষণ করিয়া দর্শনদানে কৃতার্থ করিলেন। পরে মাঘমাসে মালদহ জেলার রামকেলী গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে একটি বৃক্ষতলে বসিয়া যখন বিশ্রাম করিতেছেন, সেই সময় দবিরখাস ও সাকর মল্লিক নামে বাদ্সা হোসেনসাহর দুই উচ্চ পদস্থ কর্মচারী আসিয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন। তিনি তাহাদিগকে আলিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিয়া শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন নামে অভিহিত করিলেন। কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী করজোড়ে বলিলেন—"প্রভো! এই অসংখ্য ভক্তসঙ্গে শ্রীধাম বৃন্দাবন গমন করিলে আপনার প্রেমানন্দ আস্বাদনে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবে। শ্রীধাম বৃন্দাবন গমন করিতে হইলে হয় একাকী, না হয় একটিমাত্র মনের মত ভক্ত সঙ্গে যাইলে প্রেমানন্দ আস্বাদনের সুবিধা হইবে।" শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর মুখে এই কথা শ্রবণের পর তথা হইতে

কানাইর নাটশালা পর্যন্ত যাইয়া শ্রীবৃন্দাবন গমনেচ্ছা ত্যাগ করিয়া আবার শ্রীনীলাচল অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পথিমধ্যে শ্রীশান্তিপুর কালনা কুমারহট্ট হইয়া চৈত্রমাসের কৃষ্ণা দশমীর দিন পানিহাটিতে শ্রীরাঘব-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীএকদশীর দিন সুরধুনী তীরে বটবৃক্ষতলে প্রেমাবেশে বহুবিধ নৃত্যকীর্ত্তন করিয়া দ্বাদশীর দিন মধ্যাহ্নে পানিহাটি হইতে যাত্রা করিলেন এবং সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বরাহনগরে শ্রীল রঘুনাথের কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এখন দেখিতে হইবে শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন্ ভাবে বিভাবিত হইয়া পথে চলিতেছেন। শ্রীবৃন্দাবননিকুঞ্জে শ্যামসুন্দরের সুমধুর বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধিকা যেমন দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্যা হইয়া সেই ধ্বনি অভিমুখে ধাবিতা হইয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণবিরহ-অধীরা শ্রীগৌরাঙ্গ কিশোরী শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শনের নিমিত্ত আকুল প্রাণে চলিতে চলিতে বরাহনগর গ্রামে অতি সুললিত কণ্ঠে কেহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছেন শুনিতে পাইয়া প্রেমোন্মাদে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে শ্রীল রঘুনাথের অঙ্গনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে যিনি পাঠ করিতেছিলেন, সেই রঘুনাথ আত্মহারা হইয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহ-বিধুরা ব্রজগোপিকাদের সহিত সমবেদনা অনুভব করিতে করিতে শ্রীমদ্ভাগবতের গোপীগীত পাঠে বিভোর হইয়াছিলেন। হঠাৎ চাহিয়া দেখেন, যাঁহার শ্রীমূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি আত্মহারা হইয়া পাঠ করিতেছেন, সেই গোপীমনোহারী বংশীধারী আজ শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত হইয়া মহাতেজঃপুঞ্জশালী এক নবীন সন্ন্যাসীবেশে আসিয়া তাঁহারই অঙ্গনে নৃত্য করিতেছেন। তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "একি! গোপীদিগের কুচকুঙ্কুমে ইঁহার বসন অরুণবর্ণ হইয়াছে, না, ইনি সত্য সত্যই সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন?" কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অশ্রুকম্পপুলকাদি একেবারে অষ্ট সাত্ত্বিকভাবে বিভাবিত হইয়া পড়িলেন। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া যেমন সন্ন্যাসীর চরণতলে পতিত হইতে যাইবেন, অমনি সন্ন্যাসী "বোল বোল" ধ্বনি করিয়া তাঁহাকে উঠিতে নিষেধ করিলেন। তখন কি করেন, আবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তিনি পাঠ করিবেন কি, তাঁহার সর্ব্বশরীর তখন অষ্ট সাত্ত্বিকভাব ভূষণে ভূষিত হইয়াছে, চক্ষের জলে শ্রীগ্রন্থ ভিজিয়া যাইতেছে। শ্রীগ্রন্থের অক্ষরগুলি অস্পষ্ট দেখাইতেছে। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ

এরূপভাবে কম্পিত হইতেছে যে, শ্রীগ্রন্থ স্পর্শ করিতে পারিতেছেন না এবং তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গ পুলকে বিভূষিত হইয়াছে। কিন্তু সেই নবীন সন্ন্যাসী গোপী-গীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী আস্বাদনে অতৃপ্ত হইয়া পুনঃপুনঃ "বোল বোল" ধ্বনি উচ্চারণ করিতেছেন এবং শ্রীরাধিকার প্রিয় সহচরী শ্বেত মঞ্জরী শ্রীল রঘুনাথ সেই সন্ন্যাসীর শ্রবণ-স্পৃহা ক্রমেই উত্তরোত্তর বাড়িতেছে অনুভব করিয়া পুনঃপুনঃ সেই ভাব-অনুযায়ী শ্লোক পাঠ করিয়া আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন তিনি প্রেমভক্তির পরাকাষ্ঠাব্যঞ্জক মধুর রসাত্মক "যৎ তে সৃজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু" শ্লোকটী পাঠ করিলেন, তখন সেই ভুবনমোহন নবীন-সন্ন্যাসী আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বজ্রাঘাতে স্বর্ণচলপতনের ন্যায় ভীষণ হুঙ্কার ও গর্জন করিয়া পৃথিবীতলে পতিত হইলেন। তখন চতুর্দ্দিকের লোক সকল "হায় হায়" করিয়া ধরিবার জন্য ছুটিয়া যাইলেন কিন্তু তাঁহার কোটী সূর্য্যের ন্যায় তেজ দর্শন করিয়া কেহই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিলেন না; কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী আবার উত্থিত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

শ্রীল রঘুনাথ শ্রীগোপীগীতের যে শ্লোকগুলি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার বঙ্গানুবাদ তিনি নিজে যাহা করিয়াছেন, তাহাই পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি—

যেদিন অবধি কানু, বাজাইলে মোহন বেণু,
যমুনাতে বস্ত্র নিলে হরি।
শুন ওহে নারীচোরা, সেদিন অবধি মোরা,
ঘরে আর রহিতে না পারি।।
শুনিয়া বাঁশীর গান, পশু পাখী করে ধ্যান,
নির্ম্মল হইল যত জন।
বেগবতী নদী যত, উজানেতে বহে স্রোত,
শিশু সবে নাহি পিয়ে স্তন।
যখন ত্রিভঙ্গ হইয়া, থাক তুমি দাঁড়াইয়া,
মোহন-মুরতি নটবর।
স্তম্ভিত মরুৎ বায়, রবি নাহি বেগে ধায়,
সেরূপ দেখিয়া মনোহর।।

শ্রীমুখে সুন্দর হাসি, যেন সুধা পড়ে খসি,
পীযুষ সদৃশ রস-ভাষা।
কটাক্ষ নয়ন-কোণে, হানিলে কামিনী গণে,
নৈরাশ করিলে কেন আশা।।
তোমারে পড়িলে মনে, চাহি বৃন্দাবন পানে,
ধ্যান করি ও রাঙা চরণ।
ফুকারে কাঁদিতে নারি, অনিমিখে পথ হেরি,
যাবৎ না হয় দরশন।।
বুঝিতে না পারি মনে, নিদয় হইলে কেনে,
ওহে শ্যাম না কর চাতুরী।
ত্যজি সব পরিবার, তুয়া পদ করি সার,
কত দুঃখ দিবে হে মুরারি।।
যে ভজে তোমার পায়, তার কি এ দশা হয়,
গৃহকর্ম্ম সকল পাসরে।
হেন কাঙ্গালিনী হৈয়া, পথে পথে ভ্রমাইয়া,
ভিক্ষা মাগি খায় ঘরে ঘরে।।
কো আছ প্রাণ কানু, বাজাও মোহন বেণু,
তবে বাঁচে গোপীর জীবন।
ক্ষণেক বিলম্ব দেখি, শরীর বিকল সখি,
কোথা কৃষ্ণ দেহ দরশন।
অনেক বিলাপ করি, যতেক আভীর-নারী,
দাঁড়াইল প্রাণ তেয়াগিতে।
হেন কালে নারায়ণ, গোপী মধ্যে আগমন,
বংশীধ্বনি লাগিল করিতে।।
চরণ কমলযুগ অতি সুকোমল।
সহজেই মোদের কঠিন কুচস্থল।।
ভয় মানি কুচে আমি করি আরোপণ।

হেন পদে কর তুমি বিপিনে ভ্রমণ।।
শিলা তৃণ অঙ্কুরে বেদনা জানি লাগে।
সঙরি মোদের মনে বহু দুঃখ জাগে।।
যদি বল মোরে বাজে তোদের কি দায়।
তাহার কারণ শুন ওহে শ্যামরায়।।
তুমি মোদের পরমায়ু হও যদুবীর।
তোমারে বাজিলে প্রাণ কৈছে রহে স্থির।।
এই পরকারে বিরহিণী ব্রজনারী।
কতেক বিলাপ কৈল কহিতে না পারি।।

এইরূপে শ্রীরঘুনাথ যতই পাঠ করিতেছেন, সেই নবীন সন্ন্যাসীও প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া ততই পুনঃ পুনঃ ভূমিতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। এইরূপে রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত তিনি নৃত্য করিয়া পরে বাহ্য পাইয়া সুস্থ হইয়া বসিলেন। তখন রঘুনাথ উঠিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি যেমন সন্ন্যাসীর চরণতলে পতিত হইবেন অমনি সন্ন্যাসী তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন, "আচার্য্য! তুমি আজ আমায় বড়ই আনন্দ দান করিলে, আমি জন্মাবধি অনেকবার শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু এমন শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ আমি আর কখনও শ্রবণ করি নাই। অতএব আজ হইতে তোমার নাম—"শ্রীভাগবতাচার্য্য" হইল। তুমি এই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ছাড়া আর অন্য কোন কার্য্য করিও না, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াই তুমি তোমার জীবন অতিবাহিত করিও।

আচার্য্যের প্রতি সেই ভুবনমোহন সন্ন্যাসীর করুণা দেখিয়া ও "শ্রীভাগবতাচার্য্য" এই উপাধি শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিকের লোকসকল উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি করিয়া উঠিল—

জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকী জয়।
জয় শ্রীভাগবতাচার্য্য ঠাকুরকী জয়।।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীল ভাগবত আচার্য্যের কুটিরে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর তিন দিন অবস্থান ও পরে শ্রীনীলাচল যাত্রা

পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু সুস্থ হইয়া উপবেশন করিলে আচার্য্য ঠাকুর কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু! আমাকে কৃতার্থ করিবার জন্য আপনার কোথা হইতে আগমন হইতেছে?" শ্রীমন্মহাপ্রভু এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীনীলাচল হইতে যাত্রা করিয়া রামকেলি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পর্যন্ত সমস্ত লীলা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন।

আচার্য্য ঠাকুর যখন শুনিলেন যে, কল্য পানিহাটিতে রাঘব-ভবনে শ্রীএকাদশীতে উপবাস করিয়া অদ্য মধ্যাহ্নে দ্বাদশীর পারণ করিয়া প্রভু একই স্থানে আগমন করিয়াছেন, তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রভুর ভোগের যোগাড় করিতে যাইলেন এবং প্রভুকে গঙ্গাস্নান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

ইতিমধ্যে অরুণ আসিয়া পূর্ব্বগগনে স্নিগ্ধ কিরণ প্রকাশ করিল এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু সঙ্গীগণের সহিত গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন।

এদিকে আচার্য্য ঠাকুর যতদুর সাধ্য প্রভু ও তাঁহার সঙ্গীগণের ভোগের যোগাড় করিতেছেন, এমন সময় শ্রীবদনে "হরে কৃষ্ণ" নাম করিতে করিতে প্রভু গঙ্গাস্নান হইতে ফিরিয়া আসিলেন। আচার্য্য ঠাকুর প্রভুর শ্রীচরণ দুইখানি ধৌত করিয়া দিলেন এবং প্রভু ও তাঁহার সঙ্গীগণের ভোগের যোগাড় করিয়া দিলেন। সগণে প্রভু ভোজন করিলে আচার্য্য সেই অধরামৃত পাইয়া প্রভুর শ্রীচরণ-সেবা করিতে লাগিলেন। শ্রীচরণ দুইখানি সম্বাহন করিতে করিতে বলিলেন, "প্রভু! যদি কৃপা করিয়া এ অধমের কুটিরে পদার্পণ করিয়াছেন, তাহা হইলে কিছুদিন এই স্থানে অবস্থান করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিতে হইবে।"

এইখানে এইরূপ প্রবাদ যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু আচার্য্যের প্রেমে বশীভূত হইয়াও শ্রীভাগবত শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া তিন দিন এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং

প্রতিদিন আচার্য্যের মুখে শ্রীভাগবত শ্রবণ করিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন; শ্রীমন্মহাপ্রভু যে ঘাটে স্নান করিতেন, অদ্যাবধি সে ঘাটের নাম "**শ্রীমহাপ্রভুর ঘাট বা শ্রীচৈতন্য ঘাট**" বলিয়া বিদিত আছে।

তিনদিন এইস্থানে অবস্থানের পর বরাহনগরবাসী সমস্ত নরানারীকে প্রেমানন্দ সাগরে ডুবাইয়া সুরধুনীর তীর দিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বরাহনগরবাসীগণের চরণে কোটি কোটি নমস্কার, যাঁহাদিগের সৌভাগ্য দেবতাদেরও বাঞ্ছনীয়। কারণ, তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট-বিহার দর্শন করিয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলে আচার্য্য ঠাকুরও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু আচার্য্যকে বলিলেন, "আচার্য্য! তুমি তোমার কুটিরে ফিরিয়া যাও এবং শ্রীভাগবত পাঠ করিয়া দিন অতিবাহিত কর।" আচার্য্য বলিলেন, "প্রভু! আমি আপনার বিরহ সহ্য করিয়া কিছুতেই এ স্থানে থাকিতে পারিব না, কৃপা করিয়া আপনার সঙ্গে থাকিতে আমাকে অনুমতি দিন।" প্রভু তখন আর কিছু না বলিয়া নিজ শ্রীচরণ হইতে খড়ম জোড়াটি খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "আচার্য্য! তুমি এই খড়ম জোড়াটি লইয়া কুটিরে যাও, ইহাতেই তোমার বিরহ-জ্বালার শান্তি হইবে।" এই কথা বলিয়া প্রভু অতি দ্রুত চলিয়া যাইলেন এবং আচার্য্য সেখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে বাহ্য পাইয়া সেই খড়ম জোড়াটি মস্তকে করিয়া নিজ কুটিরে ফিরিয়া আসিলেন। অদ্যাবদি সেই খড়ম জোড়াটি শ্রীল ভাগবতাচার্য্যের শ্রীপাঠবাড়ীতে অতি যত্নে সেবিত হইতেছেন। শ্রীল ভাগবতচার্য্য ঠাকুরের ব্যবহৃত যে যে দ্রব্য অদ্যাবধি শ্রীপাঠবাড়ীতে সেবিত হইতেছেন, তাহার বর্ণনা পরে করিব। এখানে একটি ঘটনা বলিব, যাহা বরাহনগরবাসীর মুখে শুনিয়াছি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আম্রফল কুড়াইয়া পাওয়া

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন ভাগবত আচার্য্যের কুটির হইতে যাত্রা করিয়া অতি অল্পদূর (আধুনিক কুটিঘাটে) গিয়াছেন, এমন সময় পথিমধ্যে রাস্তার উপর একটি পাকা

হরিদ্রাবর্ণের আম্রফুল কুড়াইয়া পান এবং সম্মুখে একটি গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ যুবককে দেখিতে পাইয়া তাহাকে সেই আম্রফলটি দিয়া বলিলেন, 'ইহার রঙ তোমার অঙ্গের রঙের মত, অতএব তুমি এই ফলটি লও।" ব্রাহ্মণ যুবক সেই ফল হস্তে লইয়া মস্তকে ধারণ করিয়া আনিয়া নিজ বাগানে রোপণ করিলেন। সেই ফল হইতে বৃক্ষ হইলে ব্রাহ্মণ সেই বৃক্ষের নাম "শ্রীমহাপ্রভুর বৃক্ষ" রাখিলেন এবং বৃক্ষটিতে আম্র ফলিলে তাহার প্রথম আম্রটি শ্রীল ভাগবত আচার্য্য ঠাকুরের গোপালকে দিয়া তবে ভোজন করিলেন। পরে প্রসিদ্ধ বস্ত্রবিক্রেতা "জহরলাল ও পান্নালাল" সেই বাগানটি ক্রয় করিয়াছিলেন এবং "শ্রীমহাপ্রভুর বৃক্ষের" প্রথম আম্রটি শ্রীপাঠবাড়ীর শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দিয়া তবে তাঁহারা ব্যবহার করিতেন। ২১।২২ বৎসর হইল পুরাতন বৃক্ষটির প্রাপ্তি হইয়াছে এবং তাহারই সন্নিকটে একটি চারা-বৃক্ষ জন্মিয়া ঠিক সেইরূপ ফল ফলিতেছিল। কালক্রমে এখন সেই স্থান জনবসতিতে পূর্ণ হইয়াছে। এখন সে বাগান আর নাই।

যে ব্রাহ্মণ যুবকটিকে শ্রীমন্মহাপ্রভু আম্রফলটি দিয়াছিলেন, অদ্যাবধি তাঁহার পুত্র কন্যারা বরাহনগরে "সুন্দরবংশ" নামে খ্যাত। সেই বংশের শ্রীকালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন পূর্ব্বে পরলোক গমন করেছেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার পিতার নাম শ্রীদুর্গারাম বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত ঘটনাটিও লোকমুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাই লিখিতেছি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে পর্ত্তুগীজদিগের মত

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন সাঙ্গেপাঙ্গে আচার্য্য ঠাকুরের কুটির হইতে যাত্রা করিয়া সুরধুনীর তীর দিয়া নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, এমন সময় দুইজন পর্ত্তুগীজ সাহেব নৌকা করিয়া কুটিঘাটে আসিতেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে সর্ব্বাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে যাইতে দেখিয়া এক সাহেব অপরকে বলিল, "দেখ! দেখ! দুইজন পাগল যাইতেছে আর তাহাদের পিছনে অসংখ্য লোক ছুটিতেছে।" অপর সাহেবটি বলিল "না! না! এরা কখনও পাগল নয়,

তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে। মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে।।



অধুনা শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমে শ্রীলরঘু নাথ - ভাগবতাচার্য্যের শ্রীমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ' শ্রবণ।

পাগল হইলে এত লোক ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে কেন যাইবে, ইহারা নিশ্চয়ই কোন সাধু হইবে।” তাহারা উপরে আসিয়া একজন ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিল, “সর্ব্বাগ্রে যে দুইজন যাইতেছে, উহাদের নাম কি?” ভক্তটি বলিল, “একজনের নাম নিতাই আর একজনের নাম গৌরাঙ্গ।” সাহেবরা নাম দুইটি শুনিয়া চলিয়া গেল।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, ঐ সময়ে কুটিঘাটে পর্ত্তুগীজদিগের তুলা ব্যবসার কেন্দ্র ছিল এবং তাহাদের একজন গভর্ণর এখানে বাস করিত। জহরলাল ও পান্নালালের পিতা শ্রীহরিধন দাঁ এখন সেই গভর্ণরের বাড়ীটি ক্রয় করিয়া বাস করিতেছেন। প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বাবাজী মহাশয়ের শ্রীগুরুদেব এই বাড়ীটি ভাড়া লইয়া সাঙ্গোপাঙ্গে প্রায় একামাসকাল বাস করিয়াছিলেন। সে বাড়ীটিকে অদ্যাবধি লেখা আছে,—

“DUTCH KUTIR”

This house was the residence of the Dutch Governor, when Berhanogor was under Dutch possession.”

শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে যাত্রা করিলে আচার্য্য ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত খড়ম জোড়াটি প্রাণের আবেগে সেবা করিতে লাগিলেন এবং শ্রীগদাধরের আদেশে শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই পদ্যাকার বঙ্গানুবাদ শ্রীগ্রন্থখানির নাম “শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী”। এই শ্রীগ্রন্থখানি শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বপ্রথম দ্বাদশ স্কন্ধের বঙ্গানুবাদ। ইহার পূর্বে যদিও চারিখানি বঙ্গানুবাদের সংবাদ পাওয়া যায় বটে কিন্তু কোনখানিই দ্বাদশ স্কন্ধ সম্পূর্ণ নহে। এই শ্রীগ্রন্থখানি ১৩১৭ বঙ্গাব্দে শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্‌বল্লভ দ্বারা সম্পাদিত হইয়া শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত হইয়াছেন। সেই শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় তাঁহার “সম্পাদকীয় নিবেদনে” লিখিয়াছেন—

“এ পর্যন্ত ভাগবতের পাঁচখানি প্রাচীন বঙ্গানুবাদ পাওয়া গিয়াছে”।

শ্রীগুণরাজ খাঁর—শ্রীকৃষ্ণবিজয় (১০ম ও ১১শ স্কন্ধ, ১৩৯৫ শক)।

শ্রীমাধবচার্য্যের—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

শ্রীলাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের—শ্রীবিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী।

শ্রীকবিচন্দ্রের—শ্রীভাগবতামৃত।

শ্রীল রঘুনাথ আচার্য্যের—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।

প্রথম তিনখানিতে ভাগবতের অংশ বিশেষের অনুবাদ আছে। কবিচন্দ্রের শ্রীভাগবতামৃত গ্রন্থাখানি কৃত্তিবাস প্রাণীত রামায়ণের মত।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে "শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী" শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় লিখিয়াছেন—"শ্রীরঘুনাথ আচার্য্য কেবল পণ্ডিত নহেন, শ্রেষ্ঠ কবিও ছিলেন। তাঁহার ভাষার লালিত্য, মাধুর্য্যে ও ভাবগ্রাহিতাশক্তি আলোচনা করিলে সকলেই বিমুগ্ধ হইবেন।"

কেহ কেহ বলেন "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ইত্যাদি গ্রন্থে ৭ জন ভাগবতাচার্য্যের নাম পাওয়া যায়। সুতরাং বরাহনগরের ভাগবত আচার্য্যই যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর রচয়িতা, ইহা কি করিয়া স্থির নিশ্চয় হওয়া যায়।"

১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১০ম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মমহাপ্রভুর শাখা গণনায়—

রামচন্দ্র কবিচন্দ্র শ্রীগোপাল দাস।
ভাগবতাচার্য্য ঠাকুর সারঙ্গ দাস।।

২। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১০ম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শাখা গণনায়—

ভাগবতাচার্য্য চিরঞ্জীব শ্রীরঘুনন্দন।
মাধবাচার্য্য কমলাকান্ত শ্রীযদুনন্দন।।

৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১২শ পরিচ্ছেদে শ্রীগদাধর প্রভুর শাখা গণনায়—

শাখা শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ শ্রীধর ব্রহ্মচারী।
ভাগবতাচার্য্য হরিদাস ব্রহ্মচারী।।

৪। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১২শ পরিচ্ছেদে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শাখা গণনায়—

ভাগবত আচার্য্য আর বিষ্ণুদাস আচার্য্য।
চক্রপাণি আচার্য্য আর অনন্ত আচার্য্য।।

৫। শ্রীভক্তিরত্নাকরের প্রথম তরঙ্গে—

জয় জয় শ্রীভাগবত আচার্য্য মাধব শ্রীধর।
জয় দাস বৃন্দাবন গুণের সাগর।।

৬। শ্রীভক্তিরত্নাকরের ১০ম তরঙ্গে—

ভাগবত আচার্য্য আর নর্ত্তক গোপাল।
জিতমিশ্র রঘুমিশ্র পরম দয়াল।

৭। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়—

নির্ম্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।
শ্রীমদ্ভাগবতার্য্যো গৌরাঙ্গাত্যন্তবল্লভঃ।।

৮। শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যলীলা ৫ম পরিচ্ছেদে—

হেনমতে পানিহাটী গ্রাম ধন্য করি।
আছিলেন কতদিন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।
তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে।
মহা ভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে।।
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি ভাগবত লাগিল পড়িতে।।
শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ।।
বোল বোল বলে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয়ে সদায়।।
সেই বিপ্র পড়ে পরানন্দে মগ্ন হৈয়া।
প্রভুও করেন নৃত্য বাহ্য পাসরিয়া।।

ভক্তির মহিমা শ্লোক শুনিতে শুনিতে।
পুনঃ পুনঃ আছাড় পড়েন পৃথিবীতে।।
হেন সে করেন প্রভু প্রেমের প্রকাশ।
আছাড় দেখিতে সর্ব্বলোক পায় ত্রাস।।
এইমত রাত্রি তিন প্রহর অবধি।
ভাগবত শুনিয়া নাচিল গুণনিধি।।
বাহ্য পাই বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।
সন্তোষে দ্বিজেরে করিলেন আলিঙ্গন।।
প্রভু বলে ভাগবত এমত পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহার মুখেতে।।
এতেকে তোমার নাম "**ভাগবতাচার্য্য**"।
ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্য্য।।
বিপ্র প্রতি প্রভুর পদবী যোগ্য শুনি।
সবে করিলেন মহা হরি হরি ধ্বনি।।

শ্রীচৈতন্যভাগবত ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থে কেবলমাত্র ভাগবত আচার্য্যের নামটি পাওয়া যায় কিন্তু কোথাও কোন লীলা বর্ণনা করা হয় নাই।

যদিও সাত মূর্ত্তি শ্রীল ভাগবত আচার্য্যের নাম পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু শ্রীগদাধর প্রভুর আদেশ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আলিঙ্গন-শক্তিতে যে "শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী" লিখিত হইয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই স্থির নিশ্চয় হওয়া যায় যে, "শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর" রচয়িতা শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য বরাহনগরের শ্রীল ভাগবত আচার্য্য।

তারপর এই শ্রীল ভাগবত আচার্য্য যে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, তাহার প্রমাণ তিনি নিজে যাহা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তাহাই লিখিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ১ম স্কন্ধ ১ম অধ্যায়—

ধীর শিরোমণি শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান।।

১ম স্কন্ধ ২য় অধ্যায়—

কৃষ্ণ গুণ কর্ম্ম ভাই শুন সাবধানে।
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী রঘুনাথ গানে।

১ম স্কন্ধ ৩য় অধ্যায়—

রঘুনাথ পণ্ডিতের মধুরস বাণী।
গীতছন্দে কহি কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী।।

১ম স্কন্ধ ১ম অধ্যায়—

পণ্ডিত গোঁসাই শ্রীগদাধর নামে।
যাঁহার মহিমা ঘোষে এ তিন ভুবনে।
ক্ষিতিতলে কৃপায় করিল অবতার।
অশেষ পাতকী জীব করিতে উদ্ধার।।
বৈকুণ্ঠ নায়ক কৃষ্ণ-চৈতন্য মুরতি।
তাঁহার অভিন্ন তত্ত্ব সহজ শকতি।।
মোর ইষ্টদেব গুরু সে দুই চরণ।
দেহ মন বাক্য মোর সেই সে জীবন।।

এক্ষণে শ্রীল রঘুনাথ যে গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না। এবং তিনিই যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর রচয়িতা ভাগবতাচার্য্য, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি কবে যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর রচনা শেষ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোথাও কিছু সন্ধান পাই নাই। যদিও এই শ্রীপাঠবাড়ীর "শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থমন্দিরে" তিনখানি হস্তলিখিত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী পুঁথি পাওয়া গিয়াছে বটে কিন্তু কোনখানিতেই শ্রীগ্রন্থ রচনার প্রারম্ভ কিম্বা শেষ সময় কিছুই লিখিত হয় নাই।

শ্রীল ভাগবত আচার্য্য ঠাকুর কবে যে লীলা সাঙ্গ করিয়াছিলেন, সে বিষয়েও কোথাও কিছু সন্ধান পাওয়া যায় না।

১৮ বৎসর ধরিয়া শ্রীনবদ্বীপবাসী ভক্তগণ প্রতি বৎসর শ্রীনীলাচলে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে গিয়াছেন কিন্তু কোথাও আচার্য্য ঠাকুরের নাম নাই।

আমাদের শ্রীনিতাইচাঁদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীনীলাচল হইতে গৌড়দেশের জ্ঞানী মূর্খ উচ্চ নীচ ধনী দরিদ্র সকলকে প্রেমভক্তি দান করিবার জন্য এই ভাগবতাচার্য্যের কুটির হইতে ৮ মাইল দূরে পানিহাটি গ্রামে শ্রীরাঘব ভবনে আসিয়া সুরধুনীর তীরে বটবৃক্ষতলে। (অদ্যাপিও সেই বটবৃক্ষ প্রকট রহিয়াছেন) তিন মাস ধরিয়া যে সমস্ত অদ্ভুত লীলা করিয়াছিলেন এবং সুরধুনীর তীরে তীরে গ্রামে গ্রামে বেড়াইয়া যেরূপেভাবে সমস্ত গৌড়দেশ প্রেমবন্যায় প্লাবিত করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ শ্রীচৈতন্য ভাগবতের অন্ত্যলীলার ৫ম অধ্যায়ে বিশেষরূপে বর্ণিত আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের শ্রীল ভাগবত আচার্য্য ঠাকুরকে তাহার ভিতর কোথাও দেখিতে পাই না।

এইরূপে পানিহাটি গ্রামে তিন মাস।
নিত্যানন্দ প্রভু করে ভক্তির বিলাস।।
তিন মাস কারো বাহ্য নাহিক শরীরে।
দেহ-ধর্ম্ম তিলার্দ্ধেক কারে নাহি স্ফুরে।।
তিন মাস কেহ নাহি করিল আহার।
সবে প্রেম-সুখে নৃত্য বহি নাহি আর।।
তবে প্রভু সর্ব্ব পারিষদগণ মেলি।
ভক্ত গৃহে করে প্রভু পর্যটন কেলি।।
জাহ্নবীর দুই কূলে যত আছে গ্রাম।
সর্ব্বত্র ভ্রমেন নিত্যানন্দ জ্যোতির্ধাম।।
যে ভক্তি বাঞ্ছেন যোগীন্দ্রাদি মুনিগণে।
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে ভুঞ্জে যে তে জনে।।

এই শ্রীল ভাগবত আচার্য্যের শ্রীপাট হইতে তিন মাইল দূরে এঁড়িয়াদহ গ্রামে শ্রীগদাধর দাসের গৃহে আসিয়া শ্রীনিতাইচাঁদ সাঙ্গোপাঙ্গে যে সমস্ত মধুর লীলা করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের অন্ত্যলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে তাহার সুবিস্তার বর্ণনা আছে কিন্তু আমাদের আচার্য্য ঠাকুরকে সেখানেও দেখিতে পাইতেছি না। সেই জন্য কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বোধ হয় তিনি বার্দ্ধক্যবশতঃ কোথাও যাতায়াত করিতে অসমর্থ হইয়া অথবা মহাপ্রভুর আদেশ পাইয়া একস্থানে থাকিয়াই ভজন সাধন করিতেন। এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু এইস্থানে আসিবার পর দুই এক বৎসরের ভিতরেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর রচনা শেষ করিয়া তিনি লীলা সাঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহা না হইলে কোথাও না কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যাইত।

শ্রীল ভাগবত আচার্য্যের অপ্রকট

শ্রীল আচার্য্য ঠাকুর এই বরাহনগর নিবাসী একটি মাত্র ব্রাহ্মণ বালককে শিষ্য করিয়া সঙ্গে রাখিয়াছিলেন এবং তিনি অপ্রকট হইবার পূর্ব্বে ঐ শিষ্যটিকে আদেশ দিয়াছিলেন যে, "দেখ বাবা! আমার প্রাপ্তি হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে স্থানে নৃত্য করিয়াছিলেন, ঐ স্থানেই আমার সমাধি দিও, আর এই যে শ্রীমদ্ভাগবতখানি, যাহা শুনিয়া প্রভু নৃত্য করিয়াছিলেন, এখানিও আমার সঙ্গে দিও, আর তুমি যদি মনের দুঃখে কোথাও যাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই খড়ম জোড়াটি ও আমার গোপালকে আমার সঙ্গে দিয়া চলিয়া যাইও।"

শিষ্যটিও গুরুর আদেশ মত কার্য্য করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন, আর তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

এইরূপে শ্রীল ভাগবত আচার্য্য ঠাকুরের শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল। কেবলমাত্র সেই স্থানটির চিহ্ন স্বরূপ রহিল "একটি পুষ্করিণী ও তাহার তীরে দুইটি নিম্ববৃক্ষ।" যে দুইটি নিম্ববৃক্ষ হইতে পরে শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া অদ্যাবধি সেবিত হইতেছেন, সে লীলা পরে বর্ণনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীল ভাগবত আচার্য্য ঠাকুর অপ্রকট হইলে এই স্থান জঙ্গলে পূর্ণ হইতে লাগিল।

বরাহনগর নামের উৎপত্তি

প্রবাদ আছে যে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নভুক্ত পণ্ডিত শ্রীবরাহমিহির এই স্থানের রাজা ছিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য যখন আরাকান বিজয়ার্থে যুদ্ধ যাত্রা করেন, তখন তিনি এই স্থানে সৈন্যগণসহ কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। বরাহমিহির রাজার রাজবাড়ীর সংলগ্ন দুইটি বৃহৎ পুষ্করিণী ছিল। একটি পুষ্করিণী অন্দরে ছিল, তাহাতে রাজমহিষীগণ স্নান করিতেন। সেটি পরে "ঘৃত পুষ্করিণী" নামে অভিহিত হইয়াছে, সে বিবরণ পরে বলিব। এখন সেই পুষ্করিণীটি শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের শ্রীমন্দিরের পশ্চিম দিকে বিরাজ করিতেছে। আর একটি পুষ্করিণী ছিল, যাহাকে সদর পুষ্করিণী বলিত। বর্ত্তমানে সেটি "দীঘি" নামে অভিহিত হইয়া ভিক্টোরিয়া রোডে (বর্ত্তমান মহারাজ নন্দকুমার রোড) পূর্ব্বপারে বিরাজ করিতেছে। কথিত আছে, সেই বরাহমিহির রাজার নাম হইতেই এই বরাহনগর নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

শ্রীল ভাগবত আচার্য্য ঠাকুরের অপ্রকটের পর এই স্থান জঙ্গলে পূর্ণ হওয়ায় তান্ত্রিক সাধুগণের সাধন উপযোগী অনেকগুলি আসন ছিল। এখন সমস্তই অজ্ঞাত অবস্থায় আছে, কেবলমাত্র গ্রাম্য দেবী দশমহাবিদ্যার মন্দিরে একটি পঞ্চমুন্ডীর আসন আছে।

এই বরাহনগর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা আমরা পাইয়াছি তাহাই লিখিলাম, এখন ঐতিহাসিকগণ ইহার সঠিক নির্ণয় করিবেন।

বরাহনগরে বোম্বেটেদের আড্ডা

এই স্থান জঙ্গলে পূর্ণ হইলে এখানে ডাকাত এবং বোম্বেটেদের বাসস্থান

হইল। পূর্ব্বে বলিয়াছি বরাহনগর পর্ত্তুগীজদিগের ব্যবসায়ের কেন্দ্র ছিল এবং কুটিঘাটে তাহাদের এক আড্ডা ছিল। কারণ, সেই সময় সরস্বতী নদী শুষ্ক হইতে থাকায় সপ্তগ্রামের গৌরব-রবি এই বরাহনগরে উদিত হইয়াছিল। এই পর্ত্তুগীজেরা এই বোম্বেটেদের কার্য্যকলাপ জানা সত্ত্বেও কোনরূপ প্রতিকারের চেষ্টা করিত না। কারণ, বোম্বেটেরা পর্ত্তুগীজদের উপর কোনও অত্যাচার করিত না। ঐ বোম্বেটেরা জঙ্গলের মধ্যে কুটীর বাঁধিয়া স্ত্রী পুত্রাদির সহিত বাস করিত। তাহারা জাতিতে "মালী" ছিল। দিনের বেলায় তাহারা ঝুড়ি, চুবড়ী ইত্যাদি বুনিয়া স্ত্রীলোক দ্বারা গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করিত এবং রাত্রি হইলে নৌকায় করিয়া গঙ্গায় ডাকাতি করিত। ইহাদের প্রধান দুই দলপতির নাম "রামধন" ও "সিদ্ধেশ্বর" ছিল। লোকে তাহাদিগকে "রামা" ও "সিধে" বলিয়া ডাকিত। এই স্থানে তাদের ডাকাতি করিবার বিশেষ সুবিধা ছিল। কারণ, এখানে "ঘুযুড়ীর ট্যাঁক" নামে গঙ্গায় একটি ট্যাঁক বা বাঁক ছিল। ডাকাতেরা রাত্রে ঐ বাঁকে নৌকা লইয়া লুকাইয়া থাকিত এবং গঙ্গায় ঐ বাঁক থাকায় যাত্রীর নৌকার লোকেরা অদূরে কোন নৌকা আছে কি না দেখিতে পাইত না। সুতরাং যেমনি তাদের নৌকা বাঁকের নিকট আসিত, অমনি বোম্বেটেরা তাহাদের নৌকা আক্রমণ করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইত, অবশেষে নৌকাখানি মাঝ গঙ্গায় লইয়া যাত্রীসহ ডুবাইয়া দিত। তাহারা এতদূর পাষণ্ড ছিল যে, সেই মরণোন্মুখ যাত্রীদের সকরুণ কাতর আর্ত্তনাদে তাহাদের প্রাণে কণামাত্রও দয়ার সঞ্চার হইত না। ক্রমে ক্রমে এই বোম্বেটেদের দল এত বেশী হইল যে, বরাহনগরের জঙ্গলে স্থান না হওয়ায় গঙ্গার পরপারে বালীর জঙ্গলে গিয়া বাস করিতে লাগিল। পরে কিরূপে তাহারা ভীষণ বিপদে পড়িয়া এক সাধুর কৃপায় ডাকাতি ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়াছিল সে লীলা পরে বলিব।

বঙ্গদেশের বিখ্যাত রঘু ডাকাতও কিছুদিন এই জঙ্গলে আসিয়া বাস করিয়াছিল। তবে তাহার ডাকাতি অন্যরূপ ছিল, সে কখনও মানুষ হত্যা করিত না। সন্ধ্যা হইলে এক জেলা হইতে অন্য জেলায় যাইয়া ডাকাতি করিয়া রাত্রির ভিতর ফিরিয়া আসিত।

শ্রীল ভাগবত আচার্য্য ঠাকুরের প্রাপ্তির প্রায় শতাধিক বৎসর পরে কিরূপে এই স্থানে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের সেবা প্রকাশ হইয়াছিল, সেই লীলা এইবার বর্ণনা করিব।

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের সেবা প্রকাশ

শ্রীনিতাইসুন্দরের শ্রীপাট শ্রীখড়দহের গোস্বামী প্রভুদের শিষ্য কলিকাতা বাগবাজার নিবাসী শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী নামে এক ধনী ব্রাহ্মণের অম্লশুলের ব্যাধি ছিল। তিনি নানারূপ ঔষধাদি ব্যবহার করিয়া কিছুতেই শান্তি না পাইয়া পরিশেষে তারকেশ্বরে যাইয়া বাবা তারকেশ্বরের নিকট হত্যা দেন। তিন দিন অনাহারে হত্যা দিবার পর বাবা তারকনাথ তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন যে, "বরাহনগর মালীপাড়ায় গঙ্গার ধারে একটি বড় পুষ্করিণী আছে। সেই পুষ্করিণীর পূর্ব্বপাড়ের জমি খনন করিলে ১ খানি শ্রীমদ্ভাগবত, ১ মূর্ত্তি শ্রীগোপাল, ১ জোড়া খড়ম ও ১ মূর্ত্তি শালগ্রাম নারায়ণ পাইবে। সেইগুলি লইয়া এবং ঐ পুষ্করিণীর ধারে দুইটি বৃহৎ নিম্ববৃক্ষ আছে, তাহা কর্ত্তন করিয়া দুইটি শ্রীমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ঐ দ্রব্যগুলির সহিত শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের সেবা প্রকাশ কর, তাহা হইলেই তুমি এই শূলবেদনা হইতে মুক্ত হইবে।" ব্রাহ্মণ এই স্বপ্নাদেশ পাইবামাত্র সেই রাত্রেই সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন এবং দয়ারাম পাল নামে এক ব্যক্তির নিকট হইতে বরাহমিহির রাজার অন্দরের ঐ পুষ্করিণীটি ও গঙ্গার ধার পর্যন্ত উহার চতুষ্পার্শ্বের সমস্ত জমি ক্রয় করিলেন। পরে ভ্রমবশতঃ ঐ পুষ্করিণীর পূর্ব্ব পাড়ের জমি খনন না করিয়া পশ্চিম পাড়ের জমি খনন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কোন দ্রব্য না পাওয়ায় বড়ই বিষণ্ণ হইয়া আবার বাবার নিকট যাইয়া হত্যা দিতে আরম্ভ করিলেন। এবার একদিন হত্যা দিবার পরই বাবা তারকনাথ আদেশ করিলেন, "আমি তোমাকে পুষ্করিণীর পূর্ব্বপাড়ের জমি খনন করিতে বলিয়াছিলাম, তুমি পশ্চিম পাড় খুঁড়িয়াছ সুতরাং তাহ কেমনে পাইবে। যাও এইবার যাইয়া পূর্ব্বপাড় খনন কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আমার আদিষ্ট দ্রব্য পাইবে এবং আমি যাহা বলিয়াছি তাহাই করিবে।"

ব্রাহ্মণ এবার বড়ই আনন্দিত হইয়া সত্বর চলিয়া আসিলেন এবং পূর্ব্ব পাড়ের জমি খনন করিতে লোক নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু একি ভয়ানক ব্যাপার। সামান্য স্থান খুঁড়িবামাত্রই দেখা গেল—সহস্রাধিক সর্প ভীষণ ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহাদের সকলকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তখন যাহারা খনন করিতেছিল তাহারা যে যেদিকে পারিল ছুটিয়া পালাইল; পরে সেই সর্পগণ গর্তের ভিতর প্রবেশ করিলে ব্রাহ্মণ আবার তাহাদিগকে খনন করিবার জন্য ডাকিলেন। কিন্তু তাহারা প্রাণভয়ে আর খনন করিতে রাজী হইল না। তখন সমস্ত অভিমান গিয়া পড়িল বাবা তারকনাথের উপর; ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে চিন্তা করিতে লাগিল এবং মনের দুঃখে ক্ষোভে অভিমানে ও শূল বেদনার যন্ত্রণায় মনে মনে বলিতে লাগিল "হা! বাবা তারকনাথ! তুমি করুণাময় হইয়াও আমার ভাগ্যদোষে তুমিও আমার সহিত ছলনা করিতেছ। আচ্ছা বাবা থাক, আর আমি এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেছি না, অদ্য রাত্রেই আমি গঙ্গার জলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া আমার সকল যন্ত্রণার শেষ করিব। আর তোমার নিকট গিয়া হত্যা দিব না।" এতক্ষণে স্বয়ং নিতাইগৌরাঙ্গের আসন টলিল, আর কি তাঁহারা থাকিতে পারেন? আর্ত্ত-ভক্তই যে তাঁহাদের বড় আদরের। একটু পরে ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে যেমন সেই স্থানে তন্দ্রান্বিত হইয়াছে, অমনি শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ দুই ভাই ১০।১২ বছরের দুটি বালকের রূপে আসিলেন। শ্রীনিতাইচাঁদ অতি আদরের সহিত বলিতে লাগিলেন, "ব্রাহ্মণ উঠ। দুঃখ করিও না, আমি অনন্তরূপে আজ তোমাকে দর্শন দিয়াছি। যাও আর যবনের দ্বারা খনন করিও না, তুমি যাইয়া স্বহস্তে খনন কর, তাহা হইলেই তোমার অভিলষিত দ্রব্যাদি পাইবে। আর দেখ, আমাদের দুই ভাইয়ের এই যে মূর্ত্তি দেখিতেছ, ঠিক এইরূপ মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া সেবা প্রকাশ কর, তাহা হইলেই তুমি শূল বেদনা হইতে মুক্ত হইবে এবং সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিবে।"

তন্দ্রা ভঙ্গের পর ব্রাহ্মণ উঠিয়া স্বহস্তে আবার সেই স্থান খনন করিতে লাগিলেন। একটু খনন করিতেই দেখিলেন একটি সুড়ঙ্গ রহিয়াছে। তখন সেই

সুড়ঙ্গের একখানি ইষ্টক উঠাইবামাত্রই দেখিতে পাইলেন বাবা তারকনাথের আদিষ্ট সেই দ্রব্যগুলি অতি যত্নে সেইস্থানে রক্ষিত হইয়াছে। দেখিবামাত্র ব্রাহ্মণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া ধীরে ধীরে সেই দ্রব্যগুলি উঠাইলেন।

শ্রীল ভাগবত আচার্য্যের সমাজের ভিতর হইতে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি পাওয়া যায়

(১) একখানি শ্রীমদ্ভাগবত—এই ভাগবতখানির পাঠ শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া রাত্রি তৃতীয় প্রহর। পর্যন্ত নৃত্য করিয়াছিলেন। ইহা এখন শ্রীভাগবত আচার্য্যের শ্রীপাঠবাড়ীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে অতি সযত্নে রক্ষিত হইয়া সেবিত হইতেছেন।

(২) ১ মূর্ত্তি শ্রীবালগোপাল—ইনিও শ্রীপাঠবাড়ীতে অতি যত্ন সহকারে সেবিত হইতেছেন।

(৩) ১ মূর্ত্তি শ্রীশালগ্রাম—শ্রীরঘুনাথ এই শ্রীবিগ্রহ লইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, ইনিও শ্রীপাঠবাড়ীতে সেবিত হইতেছেন।

(৪) ১ জোড়া শ্রীখড়ম—এই খড়ম জোড়াটি শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীআচার্য্য ঠাকুরকে দিয়া গিয়াছিলেন, আজও শ্রীপাঠবাড়ীতে অতি যত্নে সেবিত হইতেছেন।

এই চারিটি দ্রব্য প্রাপ্ত হইবামাত্র ব্রাহ্মণ খননকার্য্য বন্ধ করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ আর কালবিলম্ব না করিয়া পরদিনই ভাস্কর ডাকিয়া সেই নিম্ববৃক্ষ দুইটি কর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গের দুইটি শ্রীমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইলেন এবং অতি শীঘ্র সেই নিম্ববৃক্ষের তলায় একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া মাঘী পূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন সেই শ্রীমূর্ত্তি দুইটি অদ্যাবধি শ্রীপাঠবাড়ীতে সেবিত হইতেছেন।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীল ভাগবত আচার্য্যের শ্রীপাঠবাড়ীর পুনঃ প্রকাশ

পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী এই শ্রীল ভাগবত আচার্য্যের লীলাস্থলীতে শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং শ্রীল রঘুনাথ আচার্য্য এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দরেকে শ্রীভাগবত পাঠ শুনাইয়া "শ্রীল ভাগবত আচার্য্য" উপাধি পাইয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম "শ্রীল ভাগবত আচার্য্যের শ্রীপাঠবাড়ী" রাখিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু যে স্থানে দাঁড়াইয়া তিন প্রহর নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই শ্রীল ভাগবত আচার্য্যের সমাধি জানিতে পারিয়া সেই স্থানটিতে একটি ছোট মন্দির নির্মাণ করিয়া সেই শ্রীমন্দিরটির নাম "শ্রীল ভাগবত আচার্য্যের পাঠঘর" রাখিলেন।

শ্রীরাধা রাধারমণ এবং শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম ও সুভদ্রা দেবী বিগ্রহগণের আগমন

শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী খড়দহের গোস্বামীপ্রভুদের শিষ্য ছিলেন। তাঁহার বাগবাজারের বাড়ীতে শ্রীরাধা রাধারমণ এবং শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীর সেবা ছিল। তিনি তখন বাগবাজারের বাড়ীর ঠাকুরদের সেবা ও বরাহনগরের শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গের সেবা, এই দুই স্থানের সেবা করিতে বড়ই অসুবিধা দেখিয়া বাগবাজারের বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া সমস্ত পরিবারের সহিত ঠাকুরদের এই স্থানে লইয়া আসিলেন। এইরূপে শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গের সহিত শ্রীরাধা রাধারমণ এবং শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবী আসিয়া মিলিত হইলেন। অদ্যাবধি সেই সমস্ত শ্রীবিগ্রহ শ্রীপাঠবাড়ীতে সেবিত হইতেছেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার বংশধরদের দ্বারা সেবা

শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী তাঁহার দুঃসাধ্য ব্যাধি শুলবেদনা হইতে মুক্ত হইয়া মহানন্দে নিজহস্তে সমস্ত ঠাকুরদের অতি যত্ন সহকারে সেবা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুকাল সেবা করিবার পর তাঁহার প্রাপ্তি হইলে তাঁহার পুত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ সেবা চালাইতে লাগিলেন। কিছুকাল সেবা করিবার পর তাঁহার প্রাপ্তি হইলে তাঁহার পুত্র শ্রীভোলানাথ সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভোলানাথের কোন পুত্রসন্তান ছিল না, তিনটি কন্যা ছিল। কন্যারা বিবাহ হইবার পর এই সেবার দিকে কোন লক্ষ্য করিতেন না, কাজেই ভোলানাথ তখন শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে একজন পুজারীর দ্বারা এই সেবা চালাইতে লাগিলেন। পরে ভোলানাথের দেহান্ত হইলে কার্ত্তিকচন্দ্র এই সেবার ভার লইয়া সেবা করিতে লাগিলেন। কার্ত্তিকচন্দ্রের শ্রীলোকনাথ নামে একটি পুত্র ছিল, কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পরেই লোকনাথ ইহধাম ত্যাগ করিল। তখন কার্ত্তিকচন্দ্র তাঁহার বিধবা পুত্রবধূ এ সেবা চালাইতে পারিবেন না ভাবিয়া ১২৩২ সালের বৈশাখ মাসে শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী নামে এক ত্যাগী ভেক্‌ধারী বৈষ্ণবের হাতে এই সেবায় ভার দিয়া তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

শ্রীস্বরূপদাস বাবাজীর সেবাপ্রাপ্তি

এইরূপে সেই বাগবাজার নিবাসী ব্রাহ্মণ নির্ব্বংশ হইলে শ্রীস্বরূপ দাস বাবাজীর দ্বারা এই সেবা চলিতে লাগিল।

১২৩২ সাল হইতে ১২৭০ সাল পর্যন্ত শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী সেবা করিয়াছিলেন।

এই স্বরূপদাস বাবাজীর সময় পূর্ব্বোল্লিখিত সেই বোম্বেটেরা মহা বিপদে পড়িয়া ইঁহার শরণাপন্ন হইয়া সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল। সেই লীলা এইবার বর্ণনা করিব।

বোম্বেটেদের বিপদ ও পরে অব্যাহতি

১২৩২ সালের ফাল্গুন মাসের একদিন সন্ধ্যার পর মুর্শিদাবাদের নবাবের একখানি নৌকা করিয়া ১০ পিপা ঘৃত কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদ যাইতেছিল। নৌকাখানি বরাহনগরের ঘুষুড়ির বাঁকের নিকট যেমন আসিয়াছে, দূর হইতে

বোম্বেটেরা তাহা দেখিতে পাইয়া অমনি নৌকা করিয়া আসিয়া নবাবের নৌকা আক্রমণ করিল এবং সমস্ত লোকদিগকে হত্যা করিয়া ঘৃতের পিপাগুলি নিজেদের নৌকায় উঠাইয়া নবাবের নৌকাখানিকে মাঝ গঙ্গায় ডুবাইয়া দিল। কেবল একটি মাত্র লোক পূর্ব হইতে জলে ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া ডুবিয়া পরপারে বালী গ্রামে যাইয়া উঠিল। পরে কোন প্রকারে মুর্শিদাবাদ যাইয়া নবাবকে এই সমস্ত সংবাদ জানাইল। নবাব ইহা শুনিয়া মহাক্রোধান্বিত হইয়া সিপাহীদিগকে আদেশ করিলেন, "যে-প্রকারেই হউক ঘৃতের পিপাগুলি খুঁজিয়া বাহির কর এবং যাহারা ডাকাতি করিয়াছে, তাহাদিগকে ধরিয়া উপযুক্ত শাস্তি দাও।" এই আদেশ শুনিবামাত্র সিপাহীগণ ডাকাতদের ধরিবার জন্য এবং ঘৃতের পিপাগুলি বাহির করিবার জন্য যাত্রা করিল। তাহারা এখানে আসিয়া বরাহনগর, বালী ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল ঘেরাও করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সর্ব্বস্থানে অন্বেষণ করিতে লাগিল।

এদিকে সেই বরাহনগরবাসী বোম্বেটেরা ঘৃতের পিপাগুলি ডাকাতি করিয়া আনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরের পশ্চিম দিকের বরাহমিহির রাজার অন্দর পুষ্করিণীতে ডুবাইয়া রাখিয়া গেল। প্রায় দুইমাস যাইতে না যাইতে তাহার মধ্যে একটা পিপা ছিদ্র হইয়া তাহা হইতে ঘৃত নির্গত হইয়া পুষ্করিণীময় ভাসিতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া বোম্বেটেদের ভয়ের পরিসীমা রহিল না। তাহারা বুঝিতে পারিল যে, কোনও রকমে নবাবের সিপাহীরা এই ঘৃত ভাসিতে দেখিলে নিশ্চয়ই তাহারা এই পুষ্করিণীতে অন্বেষণ করিবে এবং ঘৃতের পিপাগুলি দেখিতে পাইলে আমাদের সবংশে শুলে চড়িতে হইবে। তখন তাহারা বাঁচিবার আর কোন উপায় না দেখিয়া প্রাণভয়ে ভীত হইয়া স্বরূপদাস বাবাজীর নিকট আসিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল। কারণ, তাহারা শ্রীস্বরূপদাস বাবাজীকে একজন সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া জানিত। সকলে আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণে পড়িয়া গোষ্ঠীর সহিত অতি কাতরভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "বাবা! আমরা আপনার প্রতিবেশী, আমাদিগকে রক্ষা করুন, নচেৎ আমরা সগোষ্ঠী আপনার এইখানে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব।"

তখন বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "কেন? কি হইয়াছে, সবিশেষ আমার নিকট খুলিয়া বল। আমার শ্রীমহাপ্রভু বড় কৃপাময়, তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করিলেও করিতে পারেন, তোমরা কি করিয়াছ? সকলে অকপট ভাবে আমার শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গের নিকট সবিশেষ বর্ণনা কর এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর।" তখন তাহারা সগোষ্ঠী হাত জোড়া করিয়া প্রাণভয়ে কাতরভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল এবং ক্ষমা ভিক্ষা করিল। তখন বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "তোমাদের কতবার এই কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছি। তোমাদের কতবার বলিয়াছি যে, দেখ ডাকাতি কর কিন্তু নৌকাশুদ্ধ যাত্রিদের ডুবাইয়া দিয়া হত্যা করিও না। তাহাদের কাতর আর্ত্তনাদ। এতদূর পর্যন্ত আসিয়া আমাকে কত কষ্ট দিয়াছে। আমি তাহাদের কাতর আর্ত্তনাদ আর সহ্য করিতে না পারিয়া ঘরের ভিতর দরজা বন্ধ করিয়া কাঁদিয়াছি। কিন্তু তোমরা এতবড় পাষণ্ড প্রকৃতির জীব যে, কত কত স্ত্রীলোকের কত আর্ত্তনাদেও তোমাদের প্রাণে কণামাত্র দয়ার সঞ্চার হয় নাই। তাই মহাপ্রভু তোমাদের এই বিপদে ফেলিয়াছেন। এখন একটিমাত্র উপায় আছে। যদি তোমরা সকলে আমার এই শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গের নিকট প্রতিজ্ঞা করিতে পার যে—তোমরা এ জীবনে আর কখনও ডাকাতি করিবে না, তাহা হইলে আমার মহাপ্রভু তোমাদের কোনও একটা উপায় করিতে পারেন।" তখন তাহারা প্রাণভয়ে তৎক্ষণাৎ সকলে একসঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিল যে, এইবার আমাদের প্রাণ রক্ষা করুন, আমরা এ জীবনে আর কখনও ডাকাতি করিব না কিম্বা মানুষ হত্যা করিব না। আমরা ঝুড়ি চুপড়ি ইত্যাদি বুনিয়া আমাদের জীবন অতিবাহিত করিব এবং এ দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইব। তাহাদের এই প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বাবাজী মহাশয় বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার জয় দিতে লাগিলেন। পরে তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা যাও, আমি ইহার উপায় করিতেছি। কিন্তু সাবধান, এ জীবনে আর কখনও এমন কাজ করিও না।" এই বলিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। তাহারাও একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

বোম্বেটেদের জীবন রক্ষা ও ঘৃত পুষ্করিণী নাম

বোম্বেটেরা চলিয়া যাইলে পরদিন হইতে যে কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে আসিলে তাহাকেই শ্রীবাবাজী মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "দেখ, অদ্য হইতে এক মাসের ভিতর যে কেহ এই পুষ্করিণীতে পাঁচ পোয়া গব্য ঘৃত ঢালিয়া যে কোন কামনা করিয়া স্নান করিবে, তাহার সেই কামনা পূর্ণ হইবে।" এই কথা প্রচার হইবামাত্র নানাদেশ হইতে হাজার হাজার স্ত্রীলোক আসিয়া ঘড়া ঘড়া ঘৃত ঢালিয়া এই পুষ্করিণীতে স্নান করিতে আরম্ভ করিল এবং পুষ্করিণীময় সেই ঘৃত ভাসিতে দেখিয়াও কোন সন্দেহ করিতে পারিল না, তাহারা চলিয়া গেল। এইরূপে বোম্বেটেদের এ যাত্রা জীবন রক্ষা হইল এবং তাহারা জীবনের মত ডাকাতি ছাড়িয়া দিল। এবং সেই দিন হইতে এই পুষ্করিণীর নাম "ঘৃতপুষ্করিণী" হইল। অদ্যাবধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরের পশ্চিমদিকের পুষ্করিণীটিকে সকলে ঘৃত পুষ্করিণী বলিয়া থাকে।

এইরূপে শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী মহাশয়ের কৃপায় গঙ্গার উপরে ডাকাতের ভয় চিরতরে অন্তর্হিত হইল।

গভীর নিশীথে কীর্ত্তন ধ্বনি

শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী যখন এই স্থানে সেবা করিতেন, সেই সময় এখানকার প্রতিবেশী "নন্দী" ইত্যাদি ভদ্রলোকেরা প্রায় প্রতি রাত্রেই গভীর নিশীতে খোল করতালের ধ্বনি এবং উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে পাইতেন। তাঁহারা প্রাতঃকালে বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন "রাত্রিতে এখানে কাহারা কীর্ত্তন করিতেছিলেন।" বাবাজী মহাশয় মহা আনন্দিত হইয়া বলিতেন, "আমিও প্রায় প্রতি নিশীতেই শ্রবণ করি। তোমরাও মহা ভাগ্যবান, তাই তোমরা এই কীর্ত্তন শ্রবণ কর। ইহা নিশ্চয়ই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীভাগবত আচার্য্য ঠাকুরের কীর্ত্তন। তোমরা প্রতিবেশী বলিয়া কৃপা করিয়া তোমাদিগকে শুনাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই স্থানে নয় ঘণ্টা নৃত্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাই—

অদ্যাবধি সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।।"

শ্রীস্বরূপদাস বাবাজীর শিষ্য শ্রীশ্রীনিবাস বাবাজীর সেবা প্রাপ্তি

এইরূপে শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী ৩৮ বৎসর সেবা করিবার পর ১২৭০ সালে তাঁহার প্রাপ্তি হইলে তাঁহার শিষ্য শ্রীশ্রীনিবাস বাবাজী এই সেবার ভার প্রাপ্ত হইলেন। প্রতিবেশীগণ তাঁহাকে শ্রীনিবাস মহান্ত বলিতেন। তিনি স্বহস্তে অতি যত্নে ঠাকুরদের সেবা করিতেন। ১২৭০ সাল হইতে ১২৯৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি সেবা করিয়াছিলেন।

মাঘী পূর্ণিমাতে মহোৎসব

শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী মাঘী পূর্ণিমাতে শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; সেই সময় হইতে ১২৮৪ সাল পর্যন্ত প্রতি মাঘী পূর্ণিমাতে এই স্থানে মহোৎসব হইত। শ্রীশ্রীনিবাস বাবাজী মহাশয়ও ভিক্ষা করিয়া এই মহোৎসব করিতেন।

চৈত্র কৃষ্ণা দ্বাদশীতে উৎসব আরম্ভ

শ্রীনিবাস বাবাজী মহাশয় যখন শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গের সেবা করিতেন, সেই সময় কতিপয় মহাত্মা শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই স্থানে আগমন তিথিতে উৎসব করিতে উপদেশ দেন। সেই জন্য তিনি চৈত্র মাসের ফাল্গুন কৃষ্ণা দ্বাদশীতে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন জানিতে পারিয়া ১২৮৪ সাল হইতে ঐ সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন মহোৎসব আরম্ভ করেন। অদ্যাবধি চৈত্র মাসের ফাল্গুন কৃষ্ণা দ্বাদশীতে এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সেবা-প্রাপ্তি

শ্রীনিবাস মহান্ত যখন শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গের সেবা করিতেন, সেই সময় কুটিঘাট নিবাসী শ্রীরাজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নামে একটি গৃহস্থ ভদ্রলোক এই স্থানে যাতায়াত করিতেন। ক্রমে ক্রমে শ্রীনিবাস মহান্তের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। পরে শ্রীনিবাস মহান্ত এই শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গের সেবার ভার শ্রীরাজেন্দ্রনাথ

গঙ্গোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়া ১২৯৪ সালে স্বধাম প্রাপ্ত হন। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় খড়দহের গোস্বামীদের জামাতা ছিলেন। গৃহস্থদের দ্বারা কিছুকাল সেবা চলিবার পর ত্যাগী বৈষ্ণবের হাতে এই সেবা আসিয়াছিল। ১২৩২ সাল হইতে ১২৯৪ সাল পর্যন্ত ৬২ বৎসর এই সেবা ত্যাগী বৈষ্ণবের হাতে ছিল। পরে ১২৯৪ সাল হইতে এই সেবা আবার গৃহস্থের হস্তে আসিল। পুনঃ ৪০ বৎসর গৃহস্থদের দ্বারা সেবা পরিচালিত হইয়া ১৩৩৪ সালে আবার কিরূপে এই সেবা ত্যাগীর হাতে আসিয়াছে, সে লীলা পরে বর্ণনা করিব।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্বহস্তে অতি যত্ন সহকারে এই সেবা চালাইতেন। তাঁহার চার পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ শ্রীশশিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, মধ্যম শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, তৃতীয় শ্রীযতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও কনিষ্ঠ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীশশিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সেবা প্রাপ্তি

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কিছুকাল এই সেবা চালাইয়া তাঁহার প্রাপ্তি হইবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশশিভূষণের হস্তে ১৩০২ সালে এই সেবার ভার দিয়া প্রাপ্তি হন। শ্রীশশিভূষণ বেশ ভক্তিমান্ ছিলেন। তিনি স্বহস্তে অতি যত্ন সহকারে এই সেবা করিতেন। তিনি যখন এই স্থানের সেবা করিতেন, সেই সময় তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভ্রাতার নিঃ-সন্তান অবস্থায় দেহান্ত হয়। শ্রীশশিভূষণের বিজয় নামে একটি পুত্র ছিল।

শ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহাশয়কে এই সেবা দিবার প্রস্তাব

১৩১০ সালের চৈত্র মাসের ফাল্গুন কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই স্থানে আগমন উৎসবের দিন শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণদাসদেব এই উৎসব দর্শন করিতে আসেন এবং জানিতে পারেন যে, ঠাকুরের সেবার জন্য বড়ই অর্থের অভাব হইয়াছে। এবং ঠাকুরের শ্রীমন্দিরও ভগ্নদশা

প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি এই সংবাদ দক্ষিণেশ্বর নিবাসী শ্রীপ্রসন্নকুমার রায় বাহাদুর ও টাকীর জমিদার রায় শ্রীযতীন্দ্রমোহন চৌধুরী বাহাদুরকে জ্ঞাত করেন। তখন তাঁহারা দুইজনে এই সেবা মহাত্মা শ্রীচরণদাসদেবকে অর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন এবং মহাত্মাও ইহাতে রাজী হন। পরে তাঁহারা আসিয়া সেবাইত শ্রীশশিভূষণকে এই কথা বলিলে তিনিও ইহাতে রাজী হন। কিন্তু রেজেষ্টারী হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীশশিভূষণ এই সেবা হস্তান্তর করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। ইতিমধ্যে ইঁহারা প্রায় ৫০০ টাকা ব্যয় করিয়া শ্রীমন্দির ইত্যাদি মেরামত করিয়াছেন; যাহা হউক সমস্তই শ্রীভাগবত আচার্য্য ঠাকুরের ইচ্ছা মনে করিয়া চলিয়া গেলেন।

নবম অধ্যায়

শ্রীধীরেন্দ্র ও শ্রীবিজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের সেবা-প্রাপ্তি

শ্রীশশিভূষণের ১৩১৪ সালে প্রাপ্তি হইলে তাঁহার ভ্রাতা শ্রীধীরেন্দ্র ও পুত্র শ্রীবিজয় এই সেবর ভার প্রাপ্ত হইলেন এবং কোনও রকমে সেবা ও মহোৎসবাদি করিতে লাগিলেন।

শ্রীবিজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের সেবা-প্রাপ্তি

১৩২৮ সালে শ্রীধীরেন্দ্রের প্রাপ্তি হইলে বিজয় তখন তাঁহার বৃহৎ সংসার, ঠাকুর সেবা ও মহোৎসব চালাইতে অক্ষম হইয়া এই সেবা হস্তান্তর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু আয়বিহীন ঠাকুরসেবা কেহ লইতে রাজী হইলেন না। তখন বিজয় প্রায়ই শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয়কে (শ্রীরামদাস বাবাজী) বলিতেন, —"আপনি এই সেবার ভার লইয়া আমাকে সেবা-অপরাধ হতে রক্ষা করুন।" শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয়ও 'শ্রীনিতাইচাঁদের ইচ্ছা হইলেই হইবে' বলিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিতেন।

১৩৩২ ও ১৩৩৩ সালের মহোৎসব

ক্রমে ক্রমে বিজয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন উৎসব করিতে অক্ষম হইয়া গ্রামের ভদ্রলোকদিগকে বলিলেন, "আপনারা যদি পারেন তো মহোৎসব করুন, আমি সম্পূর্ণ অপারগ।" তখন স্থানীয় ভদ্রলোকেরা (বরাহনগর জমিদার বাড়ীর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অনারারী ম্যাজস্ট্রেট শ্রীবনওয়ারীলাল ঢোল, ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীআশুতোষ প্রামাণিক, বঙ্কুবিহারী সেন, ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীজীবনকৃষ্ণ সাহা) সকলে মিলিয়া একটা সভা করিলেন এবং খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া ভিক্ষা দ্বারা মহোৎসব সম্পন্ন করিলেন। পরে ১৩৩৪ সালের ৪ঠা চৈত্র তাঁহারা এই সেবা শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয়কে কিভাবে সমর্পণ করিয়াছেন তাহা বলিতেছি।

১৩৩৪ সালের মহোৎসব ও শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয়কে সেবা অর্পণ

যাহা হউক ১৩৩২ ও ১৩৩৩ সালের উৎসব স্থানীয় ভদ্রলোকেদের দ্বারা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া ভিক্ষা করিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। তখন হইতে বিজয় এবং স্থানীয় ভদ্রলোকেরা এই সেবা কোনও ত্যাগীর হস্তে অর্পণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে Sen Law & Co-র শ্রীপুলিনবিহারী দে, সালিখার পাঁচুগোপাল কুমার ইত্যাদি বাবাজী মহাশয়ের প্রিয় শিষ্যেরা কলিকাতায় একটি স্থায়ী মঠ করিবার জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া গঙ্গার ধারে একটি স্থান অন্বেষণ করিতেছিলেন। পরে বাবাজী মহাশয় যখন এই সংবাদ শ্রবণ করিলেন, তখন তাহাদিগের সকলকে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন যে, "দেখ, আমার শ্রীগুরুদেবের আদেশ আছে যে, কখনও কোন নূতন মঠ মন্দির করিয়া সেবা প্রকাশ করিও না, শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে সব লীলাস্থলী সেবার অভাবে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইতেছে, সেই সব স্থানে সেবা প্রকাশ করিবে। তাই তোমাদের বলিতেছি— তোমরা কলিকাতায় নূতন মঠ করিতে যাইও না, বরং বরাহনগরের শ্রীল ভগবত আচার্য্যের শ্রীপাঠবাড়ীর সেবা লইবার জন্য তাহারা অনেক দিন হইতে আমাকে বলিতেছে, তোমরা সেই সেবা লইবার চেষ্টা কর।" তখন বাবাজী মহাশয়ের শিষ্যেরা গুরুদেবের কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া ক্ষুন্নমনে মৌনী হইয়া রহিল। কারণ, তাহারা কলিকাতা শহরেই একটি মঠ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। যাহা হউক ক্রমে ক্রমে এই সংবাদ শ্রীল ভাগবত আচার্য্যের শ্রীপাটের সেবাইত বিজয় জানিতে পারিলেন। তিনি জমিদার দেবেন বাবুকে এই সংবাদ জানাইলে দেবেনবাবু বলিলেন "তুমি অদ্যই বাবাজী মহারাজের নিকট যাও এবং তাঁহার চরণ দুখানি মস্তকে ধারণ করিয়া বলিবে যে, 'বাবা! আমাকে এই ভীষণ সেবা-অপরাধ হইতে রক্ষা করুন, আপনি রক্ষা না করিলে আমার আর অন্য কোন উপায় নাই।' তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই এই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত ভূমির সেবা গ্রহণ করিয়া তোমাকে এই ভীষণ অপরাধ হইতে রক্ষা করিবেন। যাও, অদ্যই যাও—আর দেরী করিও না।" তখন বিজয় যাইয়া বাবাজী

মহাশয়কে কাতরভাবে এই সেবা লইবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি স্বীকৃত হইলেন এবং পরদিন তাঁহার প্রিয় শিষ্য পুলিনবাবু ও ললিতবাবুকে ডাকিয়া বরাহনগরে যাইয়া দেবেনবাবুর সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা দুইজনে আসিয়া এই বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এদিকে বাবাজী মহাশয় নিজে এই সংবাদ প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামীকে জানাইবার জন্য যাইলেন। প্রভুপাদও এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং তিনিও নিজে এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কারণ, তিনি এই বিষয়ে বড় বাবাজী মহাশয়ের সময় একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তখন কৃতকার্য্য হয়েন নাই। এখন তাহারা নিজের এই সেবা হস্তাক্ষর করিবার চেষ্টা করিতেছে শুনিয়া বিশেষ সুখী হইলেন এবং সেই দিনই বৈকালে বরাহনগর আসিয়া বিজয় ও ধীরেণের স্ত্রীকে এই বিষয়ে বলিয়া যাইলেন। এইরূপে অতি অল্পদিনের ভিতরেই দুই পক্ষে কথাবার্ত্তা ঠিক হইয়া গেল। কিন্তু শুভকার্য্যে অনেক বিঘ্ন আছে, বোধ হয় এই কথা সত্য করিবার জন্য পাঁচজনের পরামর্শে রেজিষ্ট্রী হইবার ৪ দিন পূর্ব্বে ধীরেণের স্ত্রী রেজিষ্ট্রী করিতে অস্বীকৃত হইল। পুলিনবাবু এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রই তৎক্ষণাৎ বাবাজী মহাশয়কে জানাইল এবং বাবাজী মহাশয় পুলিনবাবুকে তৎক্ষণাৎ প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। পুলিনবাবু তৎক্ষণাৎ প্রভুপাদের নিকট যাইয়া দেখেন প্রভুপাদ স্নান করিবার জন্য তৈল মাখিতেছেন। তাঁহাকে এই সংবাদ জানাইলে প্রভুপাদ মুহূর্তমাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া সেই তৈলমর্দ্দন অবস্থাতেই পুলিনবাবুর সহিত মোটরে বরাহনগরে আসিলেন এবং দেবেনবাবুকে সঙ্গে লইয়া ধীরেণের স্ত্রীর নিকট আসিয়া অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে স্বীকৃত করিলেন। পরে প্রভুপাদ এই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঘাটে গঙ্গাস্নান করিয়া পুলিনবাবুর সহিত কলিকাতায় যাইলেন।

এখানে বলিয়া রাখি যে, প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর চেষ্টাতেই শ্রীপাঠবাড়ী বাবাজী মহাশয়েরই নামে রেজিষ্ট্রী হইয়াছিল। এবং শ্রীঅতুলকৃষ্ণ প্রভুর আন্তরিক ইচ্ছাতেই বরাহনগরের শ্রীপাঠবাড়ী আজ বৈষ্ণব জগতে অদ্বিতীয়

স্থান বলিয়া প্রকাশ হইতেছে, শ্রীগ্রন্থমন্দির ও শ্রীবৈষ্ণব প্রদর্শনী তাহার নিদর্শন। যাহা হউক ঠিক এই সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন উৎসব আসিয়া উপস্থিত হইল। কাজেই স্থানীয় ভদ্রলোকেরা এবং দেবেনবাবু মহোৎসবের জন্য পূর্ব বৎসরের ন্যায় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

১৩৩৪ সালের ৪ঠা চৈত্র শনিবার বেলা ১১ টার সময় শ্রীপাঠবাড়ী বাবাজী মহাশয়ের নামে রেজেষ্ট্রী হইল

পূর্ব্বে বলিয়াছি ১৩৩৪ সালের উৎসবের জন্য স্থানীয় ভদ্রলোকেরা ভিক্ষা করিতেছিলেন। ৬ই চৈত্র উৎসবের দিন। ইতিমধ্যে ৪ঠা চৈত্র শনিবার বেলা ১১ টার সময় শ্রীপাঠবাড়ী বাবাজী মহাশয়ের নামে রেজেষ্ট্রী হইয়া গেল।

ধীরেন্দ্রনাথের স্ত্রী ও বিজয় সর্ব্বস্বত্ব ত্যাগ করিয়া বাবাজী মহাশয়কে শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গের সেবাইত করিলেন। এবং স্থাবর দ্রব্যগুলি বাবাজী মহাশয়ের নামে রেজেষ্ট্রী হইল।

১। শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ ও তাঁহাদের পুরাতন মন্দির।

২। শ্রীমন্দিরের উত্তর দিকে পতনোন্মুখ ১ খানি রান্নাঘর।

৩। শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ দিকে ঐ ভাণ্ডারঘর।

৪। শ্রীভাণ্ডারের উত্তর দিকে ঐ পঙ্গতঘর।

৫। শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বে ঐ ২ খানি বাসগৃহ।

৬। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে ছোট ১ খানি শ্রীভাগবত আচার্য্যের পাঠঘর।

৭। শ্রীশ্রীগঙ্গার ধারে ১৬ কাঠা জমি (যোল কাঠা)।

৮। দুই বিঘা ১ কাঠা জমির উপর উপরোক্ত ঘর ও শ্রীমন্দির ছিল।

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের শ্রীমন্দির ব্যতীত প্রায় সমস্ত গৃহগুলি এমন ভগ্ন অবস্থায় ছিল যে, অনেকগুলি গৃহে বাঁশের চাড়া দিয়া রাখিতে হইয়াছিল। শ্রীমন্দিরটি ১৩১০ সালে শ্রীপ্রসন্নকুমার রায় বাহাদুর মেরামত করিয়া দিয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত শ্রীমূর্ত্তিগুলি বাবাজী মহাশয়ের সেবার জন্য রেজেষ্ট্রী হইল—

১।	শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ	...	২ মূর্ত্তি
২।	শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল	...	৪ ,,
৩।	শ্রীশ্রীগোপাল	...	১ ,,
৪।	শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা	...	৩ ,,
৫।	শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী	...	১ ,,
৬।	শ্রীশ্রীবাণেশ্বর শিব	...	১ ,,
৭।	শ্রীশ্রীভগবতী	...	৯ ,,
৮।	শ্রীশ্রীনারায়ণ শিলা (অনেক প্রকারের)	...	৩২ ,,
৯।	শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত (যাহা শ্রীভাগবত আচার্য্য ঠাকুর পাঠ করিতেন)	...	১ ,,
১০।	শ্রীশ্রীখড়ম (যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু আচার্য্যকে দিয়াছিলেন)	...	৯ জোড়া
			৪৭

বাবাজী মহাশয়ের শিষ্যদের পাঠবাড়ী গমন ও প্রথম অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন

পূর্ব্বে বলিয়াছি ১৩৩৪ সালে ৬ই চৈত্র সোমবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন উৎসব ছিল এবং ৪ঠা চৈত্র শনিবার দশমীর দিন পাঠবাড়ী রেজিষ্টারি হইল। শ্রীএকাদশীর দিন (অর্থাৎ রবিবার সকালে) বাবাজী মহাশয় শ্রীননীগোপাল দাস, শ্রীচৈতন্য দাস ও শ্রীললিতমোহন দাস ইত্যাদি ১০।১২ অনুগত জনকে আদেশ করিলেন তোমরা দর্ম্মাহাটা হইতে তোমাদের আসন ইত্যাদি লইয়া পাঠবাড়ী যাও এবং সেখানে যাইয়া অষ্টপ্রহর আরম্ভ কর। তাঁহারা সেই আদেশ পাইয়া বৈকালে পাঠবাড়ী যাইলেন এবং রবিবার শ্রী একাদশীর দিন সন্ধ্যা হইতে অষ্টপ্রহর আরম্ভ করিলেন। সোমবার দ্বাদশীর দিন সকালে যাইয়া বেলা ১০টা হইতে

১২টা পর্যন্ত বাবাজী মহাশয় "শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন" কীর্ত্তন করিলেন এবং সেই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত নাম করিয়া অষ্টপ্রহর শেষ করা হইল এবং মঙ্গলবার ত্রয়োদশীর দিন প্রাতঃকালে বাবাজী মহাশয় বিরাট নগর কীর্ত্তন করিলেন। এ বৎসরের মহোৎসব দেবেন বাবু ইত্যাদি স্থানীয় ভদ্রলোকেরা সম্পন্ন করিলেন। সমস্ত পাঠবাড়ী ইত্যাদি বাবাজী মহাশয়ের নামে রেজিষ্টারি হইবার পরে বাবাজী মহাশয় দেখিলেন যে, ধীরেণের স্ত্রী এবং পুত্রকন্যাদের এমন কিছু নাই, যাহার দ্বারা তাঁহাদের জীবিকা চলিতে পারে। সেই জন্য তাহাদের ৩,৫০০ (তিন হাজার পাঁচ শত টাকার) কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া দিলেন এবং ধীরেণের বিধবা ভগ্নী ও তাঁহার পুত্রের জন্য ১,২০০ (বার শত টাকা) দিয়া বহহুগলীতে জমি কিনিয়া একটি বাড়ী করিয়া দিলেন। শ্রীদেবেন বাবু পরে পান্নালাল উকিলের নিকট হইতে পাঠবাড়ীর দলিল পত্রাদি লইয়া আসিলেন।

পাঠবাড়ীতে টোল স্থাপন

শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত বাঁকুড়া কোতলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র কাব্যতীর্থ শাস্ত্রী শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজকে তাঁহাদের স্থাপিত কোতুলপুর 'শ্রীবৈষ্ণব তোষণী' হরিসভায় প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠমাসে লইয়া গিয়া মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন। ১৩২৮ হইতে উপয্যুপরি নয় বৎসর এইরূপে শ্রীপাদ তদ্দেশবাসীগণকে ধন্য করিয়া এই মহোৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

কোতুলপুরে তখন শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশিষ্ট এক চতুষ্পাঠী ছিল। ঐ টোলে অপরাপর শাস্ত্রের অধ্যাপনা থাকিলেও শ্রীজীবগোস্বামীকৃত শ্রীশ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ ও বৈষ্ণবদর্শনের অধ্যাপনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তদ্দর্শনে শ্রীল বাবাজী মহারাজের শিক্ষিত ও শিক্ষানুরাগী শ্রেষ্ঠ সেবকগণের অন্যতম শ্রীযুক্ত রামগতি ঘোষাল মহাশয় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত পণ্ডিত মহাশয়কে তৎকালে অবস্থিত ১৯০ নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীটস্থ আশ্রমে টোল স্থাপন করিবার জন্য উৎসাহিত করেন। পণ্ডিত মহাশয়ও মহদাশ্রয়ে আপনার জীবন ও

শ্রম সার্থক করিবার নিমিত্ত এ বিষয়ে একমত হইলেন এবং পরে দর্ম্মাহাটায় আসিয়া শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণে উক্ত অভিপ্রায় জানাইলেন। তদুত্তরে শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলেন,—তাঁহার শ্রীগুরুদেব শ্রীমদ, রাধারমণ চরণদাস দেবের একটি বৈষ্ণব-টোল স্থাপনের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল। সুতরাং আমারও ইচ্ছা আছে। কিন্তু আমি তোমাকে কোনরূপ অর্থ সাহায্য করিতে পারিব না। তোমার সংসার কিরূপে চলিবে? পণ্ডিত মহাশয় বলেন—আপনার করুণা ব্যতীত অপর কোন আকঙ্ক্ষা লইয়া আমি আসি নাই। কিন্তু দশবারটি ছাত্র একান্তভাবে আমার মুখাপেক্ষী, তাহাদের কি হইবে?

শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ বলেন, 'আমার নিত্যানন্দের সংসারে এত মূর্ত্তি প্রতিপালিত হইতেছেন—এই অবস্থায় উহাদেরও আহার বাসস্থান তিনি যোগাইবেন।' এই প্রকার প্রস্তাবের পর "শ্রীশ্রীরাধারমণ চতুষ্পাঠী" নাম দিয়া বাংলা ১৩৩৩ সালে উক্ত দর্ম্মাহাটা আশ্রমে টোল স্থাপিত হয়। উপরোক্ত ছাত্রদিগকে লইয়া দুই বৎসর যাবৎ দর্ম্মাহাটায় টোল পরিচালিত হইতে লাগিল। ইহার মধ্যে যখন বরাহনগর শ্রীপাঠবাড়ীর সেবা শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ অঙ্গীকার করেন, তখন তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী ঐ টোল এই শ্রীপাঠবাড়ীতে আনীত হইয়া "শ্রীশ্রীভাগবত চতুষ্পাঠী" নামে অভিহিত হইল এবং প্রতি বৎসরই এই টোল হইতে ছাত্রগণ শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, বৈষ্ণব দর্শন, কাব্য, পুরাণ প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রে বঙ্গীয় সরকারাধীন সংস্কৃত শিক্ষা বিভাগে পরীক্ষা দিয়া উপাধি লাভ করিতে লাগিল। বর্ত্তমান এই টোল সরকারী সংস্কৃত শিক্ষা বিভাগ কর্ত্তৃক প্রথম শ্রেণীর টোল বলিয়া বিবেচিত হইয়া তদনুযায়ী সরকারী প্রদত্ত বৃত্তি পাইতেছে এবং বহু ছাত্র কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। উক্ত পণ্ডিত মহাশয়কে লইয়া উক্ত টোলের এখন তিনজন অধ্যাপক আছেন, তার মধ্যে দুইজন উক্ত টোলেরই ভূতপূর্ব্ব ছাত্র।

পাঠবাড়ীতে বৈষ্ণব-সম্মিলনী

পূর্ব্বে বলিয়াছি ১৩৩৪ সালে ৪ঠা চৈত্র পাঠবাড়ী বাবাজী মহাশয়ের নামে রেজিষ্টারি হইল এবং ৬ই চৈত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন উৎসব হইয়া গেল। পরে ১২ই চৈত্র রবিবার পাঠবাড়ীতে শ্রীবৈষ্ণব সম্মিলনী হইল। প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন, শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী, শ্রীবৃন্দাবনের গৌরাঙ্গ দাস বাবাজী ও স্বরূপ দাস বাবাজী ইত্যাদি অনেকে বক্তৃতা করিলেন। প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিলেন যে, "এই গ্রামের নাম বরাহনগরের পরিবর্ত্তে বরনগর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠনগর নাম রাখা হউক"। প্রথমে শ্রীবিশ্বরূপ গোস্বামী প্রভু, শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি কীর্ত্তন করিলেন, পরে বক্তৃতা হইল। বেলা ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত শ্রীসম্মিলনী হইল। অদ্য প্রাতঃকাল হইতেই দলে দলে স্থানীয় কীর্ত্তনের দল আসিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে প্রসাদসেবা করান হইল। অদ্যাবধি প্রতি বৎসরই এই উৎসবের সময় শ্রীবৈষ্ণব সম্মিলনী হয়।

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের শ্রীমন্দিরের ভিত পত্তন ও বাবাজী মহাশয়ের গৃহের ভিত পত্তন

১৩৩৪ সালে পাঠবাড়ীর সেবা বাবাজী মহাশয় গ্রহণ করিবার পর সর্ব্বপ্রথম শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরের সংস্কারের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং সেজন্য ঘৃত পুষ্করিণীর পূর্ব্বধারে পোস্তাটী বাঁধান হইল। কিন্তু ১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন ভীষণ বৃষ্টি হওয়ার পোস্তাটি ধসিয়া গেল, কাজেই একটি বৎসর দেরী হইয়া গেল। পরে সেই বৎসর মাঘ মাসে দুই সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া আবার পোস্তা বাঁধান হইল এবং সেজন্য Engine Pump আনিয়া পুষ্করিণীর জল ছিঁচিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। পরে ১৩৩৬ সালের ৩রা আষাঢ় সোমবার শ্রীএকাদশী তিথিতে বেলা ৯।৪০ মিনিটের সময় শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের শ্রীমন্দিরের ভিত পত্তন হইল। নিমতলার গোস্বামী প্রভু প্রথম ইষ্টক দ্বারা এই

ভিত পত্তন করিলেন এবং সেই সময় পূর্ব্বদিকে বাবাজী মহাশয়ের গৃহের ভিত পত্তন হইল। শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ তখন কিছু দিনের জন্য একটি ভগ্ন গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বাবাজী মহাশয়ের নূতন গৃহে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের অবস্থিতি

পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের শ্রীমন্দির প্রস্তুত হইবার সময় তাঁহারা কিছুদিনের জন্য ভগ্ন গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন কিন্তু ইতিমধ্যে বাবাজী মহাশয়ের গৃহ নির্ম্মাণ হইয়া গেল। তখন বাবাজী মহাশয় পাঠবাড়ী যাইলে তাঁহাকে নবনির্ম্মিত গৃহে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করা হইলে, তিনি বলিলেন—"শ্রীমন্মহাপ্রভু ভগ্নগৃহে রহিলেন আর আমি নূতন গৃহে বাস করিব, তাহা হইবে না। তোমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে লইয়া নূতন গৃহে স্থাপন কর। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু- তাঁর নব-নির্ম্মিত নিজ শ্রীমন্দিরে গমন করিলে আমি নূতন ঘরে যাইব, নতুবা যাইব না।" ১৩৩৬ সালে ১০ই অগ্রহায়ণ তারিখে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নব-নির্ম্মিত বাবাজী মহাশয়ের গৃহে আনয়ন করা হইল এবং বাবাজী মহাশয় সেই বাঁশের চাড়া দেওয়া ভগ্ন গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয়ের গৃহ-দুইটি নির্ম্মাণে (পাঁচ হাজার) টাকা ব্যয় হইয়াছিল এবং পোস্তার রাণী এই খরচ দিয়াছিলেন।

দশম অধ্যায়

কতকগুলি আশ্চর্য্য ঘটনা

১৩৩৪ সালে ৪ঠা চৈত্র বাবাজী মহাশয় এই সেবার ভার লইবার পর হইতেই এইখানে কতকগুলি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতে লাগিল, তাহাই এইবার বলিব। তখন সেবকেরা সেই বাঁশের চাঁড়া দেওয়া ভগ্ন গৃহে বাস করিতেন। শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গও কিছুদিনের জন্য এই ভগ্ন গৃহে ছিলেন। তখন পুরাতন শ্রীমন্দির ভাঙ্গা হইয়াছে, চারিদিকে বন-জঙ্গল ও ইট-পাটকেল ছড়াছড়ি রহিয়াছে। দুইটি মাত্র ভগ্ন গৃহে ৭।৮ মূর্ত্তি সেবক বাস করিতেছেন। তাহার পার্শ্বে ছোট একটি ভাণ্ডার ঘর। সেই সময়ের কয়টি আশ্চর্য্য ঘটনা এইবার বলিব।

শ্রীল ভাগবত আচার্য্যের পাঠঘর হইতে নৃত্য ও কীর্ত্তন ধ্বনি

১৩৩৪ সালের ২২শে চৈত্র সন্ধ্যাকালে আকাশে ভীষণ মেঘ করিয়াছে—গাঢ় অন্ধকারে কোলের মানুষ দেখা যাইতেছে না, আরতি কীর্ত্তনের পর যে যার আসনে বসিয়া মালা জপ করিতেছে। এমন সময় চৈতন্যদাস ও ভিখারী পূজারী নামে দুইজন সেবক ভাণ্ডার ঘর হইতে শুনিতে পাইলেন—"পাঠঘরের ভিতরে কে একজন নূপুর পায়ে করতালি দিয়া অতি সুমধুর স্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন ও মাঝে মাঝে নৃত্য করিতেছেন।" প্রায় ১০ মিনিট কাল এই সুমধুর কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া উহারা দুইজনে বাহিরে আসিলেন এবং কে এমন সুধা-মধুর নৃত্য কীর্ত্তন করিতেছে ইহা জানিবার জন্য একটি আলো লইয়া দুইজনে পাঠঘরের সম্মুখে যাইলেন। কাহাকেও সেখানে দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা ঠাকুর ঘরের সম্মুখে যাইয়া সেবক মুকুন্দকে (পানিহাটির) জিজ্ঞাসা করিলেন—"এইমাত্র কে এখানে অতি মধুর নৃত্য কীর্ত্তন করিতেছিল?" মুকুন্দ বলিল—"আমিও শুনিয়াছি বটে কিন্তু আমি ঠাকুরদের শিঙ্গার কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় ওদিকে বিশেষ কান দিই নাই।" তখন চৈতন্যদাস ও ভিখারী পূজারী দুইজনে আশ্রমস্থ সমস্ত ভক্তকে

জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই বলিলেন—"আমরা তো কিছুই জানি না।" তখন তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কম্পিত কলেবরে যাইয়া দেবেন বাবুকে (ডবু বাবু) এই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলে তিনি বলিলেন—"এই তো প্রথম আরম্ভ হইয়াছে—ইহার পর আরও অনেক দেখিতে ও শুনিতে পাইবে।"

দ্বিতীয়বার পাঠঘর হইতে নৃত্য ও কীর্ত্তন ধ্বনি

পূর্ব্ব কথিত ঘটনার কিছুদিন পরেই ঠাকুর মন্দির তখন ভাঙ্গা হইয়াছে—ঠাকুররা ভগ্ন গৃহে আছেন, একাদশীর অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন হইতেছে। সে দিনও ভীষণ মেঘ করিয়া সমস্ত জগৎ অন্ধকারে ছাইয়া ফেলিয়াছে। সন্ধ্যা আরতির পর চৈতন্যদাস শ্রীভাগবত আচার্য্য ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করিবার জন্য পাঠঘরের নিকট যাইয়া শুনিতে পাইলেন যে, "পাঠঘরে নূপুর পায়ে কে একজন নৃত্য করিতেছে ও অতি ধীরে ধীরে কীর্ত্তন করিতেছে।" তিনি তখন পাঠঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া কিছুক্ষণ পর্যন্ত শ্রবণ করিলেন। পরে ললিত বাবুর ঘরে যাইয়া দেখেন যে, ললিতদা ও বৃদ্ধ যজ্ঞেশ্বরদা দুইজনে বসিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন, তখন তাঁহাদিগকে এই ঘটনা বলিলে তাঁহারা তিন জনে দ্রুতবেগে পাঠঘরের সম্মুখে আসিয়া প্রায় অর্দ্ধঘটা পর্যন্ত এই নূপুরের ধ্বনি শ্রবণ করিলেন। সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। পরে নূপুরের ধ্বনি থামিয়া গেলে তাঁহারা ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের বিবিধ মন্দিরে অবস্থান

১৩৩৪ সালের ৪ঠা চৈত্র হইতে ১৩৩৫ সালের ১৮ই মাঘ পর্যন্ত ১১ মাস শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ তাঁহাদের পুরাতন শ্রীমন্দিরেই ছিলেন। পরে ১৩৩৫ সালের ২০শে মাঘ পুরাতন শ্রীমন্দির ভাঙ্গা হইলে ১৮ই মাঘ হইতে ১৩৩৬ সালের ১০ই অগ্রহায়ণ পর্যন্ত (প্রায় ১০ মাস) শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ পুরাতন ভগ্ন গৃহে ছিলেন, পরে ১৩৩৬ সালের ১০ই অগ্রহায়ণ তাঁহারা নবনির্ম্মিত বাবাজী মহাশয়ের

গৃহে গমন করেন। সেখানে প্রায় ১১ মাস থাকিবার পরে ১৩৩৭ সালের ৫ই কার্ত্তিক তাঁহারা নবনির্ম্মিত তাঁহাদের নিজ শ্রীমন্দিরে গমন করিলেন। সেইদিন হইতে সেই শ্রীমন্দিরেই আছেন।

গভীর নিশীথে পায়ে খড়ম দিয়া এক মূর্ত্তির পাঠঘরে গমনাগমন ও আম কুড়ান

১৩৩৫ সালের ১৮ই মাঘ হইতে ১৩৩৬ সালের ১০ই অগ্রহায়ণ পর্যন্ত প্রায় ১০ মাস শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ একটি ভগ্নগৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময় মঠের সেবাইতরা সেই ভগ্ন গৃহের বারান্দায় রাত্রে শয়ন করিতেন। সেই সময় প্রায়ই তাঁহারা গভীর নিশীথে দেখিতে পাইতেন যে, এক মূর্ত্তি দীর্ঘাকার পুরুষ খড়ম পায়ে দিয়া পাঠঘর হইতে বহির্গত হইয়া উঠানে বেড়াইতেছেন। এই দৃশ্য দর্শন করিয়া চৈতন্যদাস ও ননীগোপাল দাস ভূত মনে করিয়া বিষম ভীত হইয়া পড়েন। পরে সেই দীর্ঘাকার পুরুষ আবার পাঠঘরে গমন করিলেন। তখন তাঁহারা পরস্পরে নিশ্চয়ই ভূত দেখিয়াছি ইহা সাব্যস্ত করিয়া বিষম ভীত হইয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া অতিবাহিত করিলেন। পরদিন সকালে এই সংবাদ দেবেন বাবু এবং মঠবাসিদিগকে জানাইলে দেবেন বাবু বলিলেন, আপনারা মহা ভাগ্যবান, আপনারা যাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন উনি ভূত নন, উনি শ্রীভাগবত আচার্য্য ঠাকুর, তিনি কৃপা করিয়া আপনাদিগকে দর্শন দিয়াছেন।' টোলের পণ্ডিত শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ও একদিন দ্বাদশীর রাত্রে প্রথম নিদ্রা ভঙ্গের পর রাত্রি আন্দাজ ২টার সময় নিজ শয্যায় বসিয়া শুনিতে পান—পুরাতন শ্রীমন্দিরের রকে কে যেন মধুর নূপুর ধ্বনি করিতে করিতে এদিক ওদিক করিতেছে। প্রায় আধঘণ্টা এইরূপ শুনিয়া তিনি পুনরায় নিদ্রিত হইয়া পড়েন। স্থানীয় ভদ্রলোক শ্রীজীবনকৃষ্ণ সাহা বলিলেন যে, একদিন জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ রাত্রিতে এই আম বাগানে আম কুড়াইতে আসিয়া অদূরে এক দীর্ঘাকার পুরুষ, গায়ে একখানি চাদর জড়ান, খড়ম পায়ে দিয়া তাঁহার সহিত আম কুড়াইতে দেখিয়াছেন। পরে তাঁহার সন্দেহ হওয়ায় এ ব্যক্তি কে ইহা জানিবার জন্য যতই তাঁহার নিকটে


ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।

যাইতেছেন, ততই তিনি দূরে দূরে চলিয়া যাইতেছেন। অবশেষে এই বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। তখন সাহা মহাশয়ের সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল। কারণ, তিনি জানিতেন-এ বাড়ীতে এত বড় দীর্ঘাকার পুরুষ কেহ নাই, তবে ইনি কে? পরে মনে মনে ঠিক করিলেন যে, ইনি নিশ্চয়ই শ্রীভাগবত আচার্য্য ঠাকুর হইবেন। আর একদিন কামাখ্যা দাস বাবাজীর শিষ্যা হরেকৃষ্ণ মাতা শেষ রাত্রে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিবার সময় দূরে দূরে এক দীর্ঘাকার পুরুষকে আসিতে দেখিয়াছেন। তিনি শেষে অনুমান করিয়াছেন যে, ইনি নিশ্চয়ই শ্রীভাগবত আচার্য্য ঠাকুর মহাশয় হইবেন।

অত্যাশ্চর্য্যভাবে এক মূর্ত্তি শালগ্রাম প্রাপ্তি

১৩৩৬ সালের ১৬ই ফাল্গুন শনিবার শ্রীএকাদশী তিথিতে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের শ্রীমন্দিরের নব-নির্ম্মিত (বাবাজী মহাশয়ের ঘরের) বারান্দায় অষ্টপ্রহর হইতেছিল। এমন সময় বেলা তখন ৪টা হইবে, রাধিকা নামে ঠাকুরের সেবাইত ঠাকুর মন্দিরের দরজা খুলিয়া ঘরের ভিতর যাইয়া দেখেন যে, শ্রীনারয়ণের সিংহাসনের বিছানায় নীচে এক মূর্ত্তি শালগ্রাম রহিয়াছেন, তাঁহার গলায় রূপার পৈতা এবং উপর নীচে চন্দন মিশ্রিত কাঁচা তুলসীর পত্র। এই দৃশ্য দেখিয়া রাধিকা তৎক্ষণাৎ ললিত বাবু এবং দেবেন বাবুকে (ডবু বাবু) ডাকিয়া আনিয়া দেখাইলেন। তাঁহারা দুজনে ও অন্যান্য ভক্তগণ সকলে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেলেন এবং সকলে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিয়া অতি যত্ন সহকারে সেবা করিবার জন্য রাধিকাকে আদেশ করিলেন। সেই দিন হইতে অন্যান্য শালগ্রামের সহিত তিনিও সেবিত হইতেছেন।

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের নূতন শ্রীমন্দিরে গমন

১৩৩৭ সালের ৫ই কার্ত্তিক বুধবার প্রতিপদ তিথিতে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল এবং সেইদিন বেলা ১০।৪০ মিনিটের সময় শ্রীশ্রীনিতাই

গৌরাঙ্গ নব-নির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে গমন করিলেন। সেই সময় খড়দহের প্রভুপাদ শ্রীজিতেন্দ্রলাল গোস্বামী, প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সিঙ্গুরের দাদামহাশয় প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন এবং উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন কাঁসর ঘণ্টা ইত্যাদি বাদ্যের সহিত শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গকে বক্ষে করিয়া বাবাজী মহাশয়ের ঘর হইতে নূতন শ্রীমন্দিরে লইয়া যাওয়া হইল। পরে বিরাট মহোৎসব হইল। এই সময় বাবাজী মহাশয়ের শরীরর অসুস্থ থাকায় তিনি প্রায় ১৫।১৬ দিন দেবেন বাবুর (ডবু বাবুর) বাড়ীতে ছিলেন।

কলিকাতা গ্রে স্ট্রীটের নিকট রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটের শ্রীবরেন্দ্রনাথ রায়ের মাতাঠাকুরাণী তাঁহার স্বামী ঁবংশীধর রায়ের স্মৃতিকল্পে ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা ব্যয়ে এই শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। শ্রীমন্দিরগাত্রের পাথরখানিতে আশ্বিন মাস লেখা আছে। কারণ, ঐ মাসেই শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠার কথা ছিল। কিন্তু শুভদিন না পাওয়ায় ৫ই কার্ত্তিক শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের অলঙ্কার

বাবাজী মহাশয় যখন শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের সেবা গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদের পরণে দুইখানি কাপড় ছিল ও কোমরে দুইখানি রূপার কোমরপেটি ছিল। আর কিছু ছিল না। ক্রমে ক্রমে ভক্তেরা কাপড় চাদর এবং কিছু কিছু গহনা দিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভেলভেটের পোষাক

বরাহনগর জমিদার বাড়ীর দৌহিত্র শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (ডবু বাবু) শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলের জন্য প্রায় ৪০ (চল্লিশ টাকা)। খরচ করিয়া দুই সেট ভেলভেটের সাচ্চা পোষাক প্রস্তুত করাইয়া দেন। এই পোষাক দুই সেট এমনভাবে বড় করিয়া প্রস্তুত করান হয়, যাহাতে অলঙ্কার ইত্যাদি পোষাকের উপরে পরান হয়। ইহা ১৩৩৭ সালের পৌষ মাসের ঘটনা।

অত্যাশ্চর্য্যভাবে শ্রীযুগলের দেহপুষ্টি

১৩৩৭ সালের মাঘ মাসে কলিকাতাবাসী একজন ভক্ত যুগলের জন্য দুই জোড়া সোনার বালা দিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। পরদিন একজন স্বর্ণকার ডাকা হইল। পরে দেবেনবাবু এবং স্বর্ণকার শ্রীমন্দিরে যাইলে সেবাইত শ্রীমুকুন্দ (পানিহাটির) শ্রীযুগলকে সিংহাসন হইতে নীচে নামাইলেন এবং এমনভাবে বড় করিয়া শ্রীযুগলের হস্তের মাপ লওয়া হইল, যেন ভেলভেটের পোষাকের উপরে বালা জোড়াটি পরান যায়। পরে বালা প্রস্তুত হইয়া আসিলে সর্ব্বসমক্ষে ভেলভেটের জামার উপরে পরান হইল। ইহার কিছুদিন পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন উৎসবের দিন পুনরায় শ্রীযুগলের হস্তে বালা পরাইতে যাইলে দেখা গেল বালা জোড়াটি এত ছোট হইয়া গিয়াছে যে, সাদা জামার উপরেও কিছুতেই পরান গেল না, এমন কি জামা খুলিয়া শুধু হাতেও পরান গেল না। পরে দেখা গেল ভেলভেটের জামাটিও ছোট হইয়া গিয়াছে। তখন সকলে মনে করিল যে, ঠাকুর মনের মত সেবা পাইয়া আনন্দে মোটা হইয়াছেন। তাই বালা এবং পোষাক ছোট হইয়া গিয়াছে। সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পোষাক এবং বালা দুই জোড়া অদ্যাপি পাঠবাড়ীতে আছে।

শ্রীনাটমন্দিরের ভিত পত্তন

১৩৩৮ সালের ৩০শে বৈশাখ বুধবার শ্রীএকাদশী তিথিতে প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীনাটমন্দিরের ভিত পত্তন করিলেন। খড়দহের প্রভুপাদ শ্রীজিতেন্দ্রলাল গোস্বামী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ইট ও কর্ণিক লইয়া স্বহস্তে ভিত পত্তন করিলেন।

শ্রীনাটমন্দির প্রতিষ্ঠা

১৩৩৯ সালের ১৬ই চৈত্র এই নাটমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। কলিকাতা ৭৫নং বলরাম দে স্ট্রীটের ৺রঘুনাথ শেঠ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺নন্দলাল শেঠ মহাশয়ের

পত্নী তাঁহার স্বামীর স্মৃতিকল্পে ১২,০০০ (বার হাজার) টাকা ব্যয়ে এই শ্রীনাটমন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীল ভাগবত আচার্য্যের পাঠঘর নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা

শ্রীনাটমন্দিরের সঙ্গো সঙ্গো শ্রীল ভাগবত আচার্য্যের পাঠঘরও নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ঘরটিও ১,০০০ (এক হাজার) টাকা ব্যয়েঁ নন্দলাল শেঠ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী তাঁহার পতির স্মৃতিকল্পে নির্ম্মাত করিয়া দিলেন। ১৩৩৯ সালের ৬ই চৈত্র এই পাঠঘর প্রতিষ্ঠিত হইল।

শ্রীগ্রন্থমন্দিরের সূচনা

১৩৩৯ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ মৈত্রের গৃহ হইতে ৫টি খুব বড় বাক্স করিয়া প্রায় দেড় সহস্র বহু পুরাতন হস্ত লিখিত পুঁথি পাঠবাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুর্শিদাবাদের শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় এই সমস্ত পুঁথি-ভাণ্ডার হইতে গোস্বামীগ্রন্থগুলি ছাপাইয়া বৈষ্ণব-জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। পুজ্যপাদ শ্রীবাবাজী মহাশয় তখন পাঠবাড়ীতে ছিলেন। তিনি পুঁথির বাক্সগুলি দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া সেবকদিগকে আদেশ করিলেন, 'এখনি এই পুঁথির বাক্সগুলিকে আরতি কর, পরে ভোগ দাও, ইহার পর কীর্ত্তন ইত্যাদি করিয়া শ্রীভগবদ্, বিগ্রহের মত সেবা আরম্ভ কর এবং প্রতিদিন এইরূপভাবে সেবা কর, যেন ইহার অন্যথা না হয়।' আমি বাবাজী মহাশয়ের এই কথাগুলি শুনিয়া দেওয়ালের গায়ে অবস্থিত একখানি শ্রীশ্রীসরস্বতী মাতার চিত্রপট আনিয়া বাক্সের উপর বসাইয়া দিলাম। সেদিন তাঁহাকেই আরতি করা হইল। পরদিন একখানি বড় শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের চিত্রপটও সেই বাক্সের উপর বসাইয়া দিলাম। সেই দিন হইতে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের পাশে শ্রীশ্রী সরস্বতী দেবী ও সেবিত হইতেছেন। পরে বাবাজী মহাশয় বলিলেন, 'এই পুঁথিগুলিকে রাখিবার জন্য উপযুক্ত শ্রীমন্দির যদি করা না হয় তাহা হইলে আমার জীবন অধন্য।' এই কথা কয়টি শুনিবামাত্র

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস নামে শ্রীধাম পুরীবাসী একজন ভক্ত তাঁহার সুটকেশ খুলিয়া একখানি কাগজ বাহির করিয়া বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণের নিকট রাখিয়া দণ্ডবৎ করিলেন। পুলিনদা কাগজখানি কুড়াইয়া লইয়া দেখিলেন—ইহা একখানি ২০০০ (দুই হাজার) টাকার কোম্পানীর কাগজ। সকলে শ্রীল ভাগবত আচার্য্য ঠাকুরের লীলা দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। পুলিনদা তৎক্ষণাৎ বঙ্কিমদাকে বুকে ধরিয়া বলিলেন, 'ভাই, তুমি যথার্থ শ্রীগুরুর সেবা করিলে, তোমার জীবন ধন্য।' যাহা হউক, পুলিনদা ইতিমধ্যে প্রায় ৪,০০০ (চার হাজার) টাকার শ্রীগ্রন্থমন্দিরের জন্য জমি ক্রয় করিলেন। পরে পোস্তার রাণী প্রায় ২০,০০০ (কুড়ি হাজার) টাকা ব্যয় করিয়া এই গ্রন্থ-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

শ্রীশ্রীগ্রন্থমন্দিরের ভিত পত্তন

১৩৪০ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার বেলা ৯ টার সময় প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকূল গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরের ভিত পত্তন করিলেন। ভকতগণ উচ্চৈঃস্বরে খোল করতাল যোগে শ্রীনাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী একখানি রূপার কর্ণিক হস্তে লইয়া ইট দিয়া ভিত পত্তন করিলেন। পরে শ্রীগোবর্দ্ধন গোস্বামী, পরে বাবাজী মহাশয়, পরে দেবেন বাবু, পরে ললিত বাবু, পরে আমি, পরে অপরাপর সকলেই এক একখানি ইট লইয়া কর্ণিক দ্বারা ভিত পত্তন করিলেন। সকলের আনন্দ আর ধরে না। পানিহাটির শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয় অনেক দিন হইতে বহু পুরাতন প্রায় দুই সহস্র পুঁথি সংগ্রহ করিয়া বাবাজী মহাশয়কে একটি গ্রন্থ মন্দির করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন, তাঁহারও সেই বাসনা পূর্ণ হইবার উপক্রম হইল। ইহা ব্যতীত তিনি বৈষ্ণব প্রদর্শনীর জন্যও অনেক দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেগুলিও যথাযোগ্য স্থানে রাখিবার স্থান হইবে জানিয়া আরও আনন্দিত হইলেন। শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের ইচ্ছাক্রমে উক্ত গ্রন্থমন্দির শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দির নামে অভিহিত হইল।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে শ্রীগ্রন্থের আগমন

১৩৪১ সালের ২৫শে মাঘ শুক্রবার শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজার দিন শ্রীগ্রন্থগুলি বাবাজী মহাশয়ের গৃহ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে আনা হইল এবং সেই দিন হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরেই আরতি, ভোগ, কীর্ত্তন ইত্যাদি হইতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে শ্রীবাবাজী মহাশয়ের গৃহেই শ্রীগ্রন্থাদির সেবা হইত।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির ও বৈষ্ণব-প্রদশনী প্রতিষ্ঠা

১৩৪১ সালের ২২শে চৈত্র শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির ও বৈষ্ণব-প্রদশনী প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৭ই চৈত্র হইতে ২৩শে চৈত্র পর্যন্ত সাত দিবসব্যাপী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরে শ্রীগ্রন্থের পারায়ণ হইল। আট মূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন শ্রীগ্রন্থ পাঠ করিলেন। প্রাতঃ ৬টা হইতে ৯টা পর্যন্ত পারায়ণ হইল।

শ্রীগুরুদাস বাবাজী—শ্রীমদ্ভাগবতের ৯ম ও ১০ম স্কন্ধের ৪৫ অধ্যায় পর্যন্ত।
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শাস্ত্রী— ঐ ৫ম হইতে ৮ম স্কন্ধ পর্যন্ত।
শ্রীগৌরদাস বাবাজী (উপেন) ঐ ১ম হইতে ৪র্থ স্কন্ধ পর্যন্ত।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ কবিরাজ ঐ ১০ম স্কন্ধের ৪৫ অধ্যায় হইতে ১২শ স্কন্ধ পর্যন্ত।

শ্রীনবদ্বীপ দাস বাবাজী—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অর্দ্ধ
শ্রী পরিমল ঠাকুর— ঐ অর্দ্ধ
শ্রীহরিদাস ঘোষাল—শ্রীচৈতন্যভাগবত সম্পূর্ণ
শ্রীকালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল সম্পূর্ণ
ইত্যাদি ক্রমে সকলে পারায়ণ করিলেন।

অদ্য ১৭ই চৈত্র শ্রীপাঠবাড়ীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন তিথি। বাবাজী মহাশয় রাত্র ৮টা হইতে ১১টা পর্যন্ত (শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাঠবাড়ী আগমন) কীর্ত্তন করিলেন।

২২শে চৈত্র শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। সেইদিন পাঠবাড়ীতে শ্রীবৈষ্ণব সম্মিলনী হইল। অসংখ্য ভক্ত এই গ্রন্থ মন্দির ও বৈষ্ণব প্রদশনী

দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। সকলেই বলিলেন এইরূপ শ্রীগ্রন্থমন্দির ও বৈষ্ণব প্রদর্শনী জগতে অদ্বিতীয়। সেইদিন হইতে এই শ্রীগ্রন্থমন্দির সর্ব্বসাধারণের জন্য খোলা থাকে। এই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরের অপ্রকাশিত পুঁথিগুলি আমাদের "শ্রীশ্রীনিতাই সুন্দর" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছেন এবং বৈষ্ণব প্রদর্শনীর বিবরণও প্রকাশিত হইতেছেন।

পানিহাটি হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন

১৩৪১ সালের ১৫ই চৈত্র কৃষ্ণা দশমীর দিন শ্রীমন্মহাপ্রভু পানিহাটি শ্রীরাঘব ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে ১৬ই চৈত্র শ্রীএকাদশীর দিন সুরধুনী তীরে বটবৃক্ষতলে অষ্টপ্রহর শ্রীনাম কীর্ত্তন করিলেন। বাবাজী মহাশয় অদ্য বৈকালে পানিহাটি যাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দন্ডবৎ করিয়া ও কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া শ্রীপাঠবাড়ী আসিলেন। পরদিন ১৭ই চৈত্র দ্বাদশীর দিন পানিহাটির শ্রীঅমূল্যধন রায়ভট্ট মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীরাঘব ভবন হইতে সঙ্গে লইয়া একখানি সুসজ্জিত নৌকায় বসাইয়া খোল করতাল যোগে উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীপাঠবাড়ী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে বাবাজী মহাশয় শ্রীপাঠবাড়ী হইতে একখানি সুসজ্জিত সিংহাসন লইয়া বেলা ৫টার সময় অসংখ্য ভক্ত সঙ্গে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে গঙ্গার ঘাটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। প্রায় ১০ মিনিট দণ্ডায়মান থাকিবার পর অদূরে একখানি লাল পতাকাধারী সুসজ্জিত নৌকা দর্শন করিয়া ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে "গৌর হরিবোল" দিতে লাগিলেন ও মধ্যে মধ্যে "জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকি জয়" বলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নৌকাখানি গঙ্গার ঘাটে আসিয়া লাগিল। শ্রীনন্দ কাকা যাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মস্তকে করিয়া আনিয়া সেই সুসজ্জিত সিংহাসনে বসাইলেন। কিছুক্ষণ সুরধুনী তীরে নৃত্য কীর্ত্তনের পর ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ঘিরিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীপাঠবাড়ী আনিলেন এবং যে স্থানে ৪২৫ বৎসর পূর্ব্বে দাঁড়াইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ৯ ঘণ্টা উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই স্থানে তাঁহাকে বসান হইল এবং আমাদের টোলের পণ্ডিত

মহাশয় শ্রীগোবিন্দচন্দ্র কাব্যতীর্থ শ্রীমদ্ভাগবতের গোপী-গীত পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলেন। পরে রাত্রে বাবাজী মহাশয় "শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাঠবাড়ী আগমন" কীর্ত্তন করিলেন। অদ্য প্রাতঃকাল হইতে ২৪ প্রহর শ্রীনামযজ্ঞ আরম্ভ হইল ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে ৮ মূর্ত্তি পারায়ণ আরম্ভ করিলেন। এই বৎসর হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু নৌকা করিয়া পানিহাটি হইতে শ্রীপাঠবাড়ী আসেন। ২০শে চৈত্র বুধবার রাত্র ৯টা হইতে ১টা পর্যন্ত শ্রীপাঠবাড়ীতে "হাওড়া সমাজ" কর্ত্তৃক "নদের নিমাই" যাত্রা হইল। পরে ২২শে চৈত্র শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণব-সম্মিলনী হইল। পরে ২৪শে চৈত্র প্রাতে বাবাজী মহাশয় বিরাট নগর-কীর্ত্তন করিলেন। পরে ১৮৩টি মহান্তের মালসা ভোগ ও বিরাট মহোৎসব হইল।

এই মহোৎসবের ধারা অদ্যাবধি শ্রীপাঠবাড়ীতে অব্যাহত আছে। শ্রীল ভাগবতচার্য্য ও শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয়ের ইচ্ছায় শ্রীপাঠবাড়ীর ক্রমোন্নতি ঘটিতেছে।

শ্রীল ভাগবত আচার্য্য ঠাকুর ও শ্রীসাধু গুরু এবং বৈষ্ণবের কৃপায় শ্রীল ভাগবত আচার্য্যের লীলাপ্রসঙ্গ লিখিত হইলেন এবং এইখানেই এ লীলার শেষ করিলাম।

সমাপ্ত